Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

গুনাহগার

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর

Boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার ১৯৩৫ সনে নাটোর থানায় হাটবিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে নাটোর জেলা সদরের শুকুলপট্টিতে সপরিবারে বসবাস করছেন।

পারিবারিক পরিবেশে তার শিক্ষাজীবন শুরু। তিনি ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন পাস করেন। অতঃপর আই.এ; বি.এ. (অনার্স); এম.এ. (ইতিহাস); এম.এ. (ইংরেজি); বি.এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড লন্ডন থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এছাড়া তিনি মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও প্রয়োজক ছিলেন।

তিনি একাধারে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, রম্য, শিশু সাহিত্য, রূপকথা প্রভৃতি রচনা করেছেন। বলা যায় সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পদচারণা অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক। তবে কথা সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ও আলোচিত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। বাংলাদেশ ও ভারতের কোলকাতা থেকে এপর্যন্ত তার প্রায় ২৮টি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে তাঁর যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো :

১. বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা থেকে শফীউদ্দীন সরদারের যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে : বিদ্রোহী জাতক, রোহিনী নদীর তীরে, ঝড়মুখী ঘর, দখল, ঈমানদার ও গুনাহগার। রোকন

২. আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে : গৌড় থেকে সোনার গাঁ, বার পাইকার দুর্গ, রাজবিহঙ্গ, প্রেম ও পূর্ণিমা, বিপন্ন প্রহর, বৈরী বসতি, অন্তরে প্রান্তরে, দাবালন, ঠিকানা।

৩. মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বখতিয়ারের তলোয়ার, যায় বেলা অবেলায়, শেষ প্রহরী, বারো ভূইয়া উপখ্যান, অবৈধ অরণ্য, দুপুরের পর, রাজ্য ও রাজকন্যারা, থার্ড পণ্ডিত ও মুসাফির। বইঘর

এছাড়া অন্যান্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সূর্যাস্ত, পথহারা পাখী, অপূর্ব অপেরা, পাষাণী প্রভৃতি।

'গুনাহগার' শফীউদ্দীন সরদারের লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি নতুন সামাজিক উপন্যাস। বর্তমান সমাজের অবক্ষয় উপন্যাসটিতে খুবই স্বার্থকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'গুনাহগার' উপন্যাসটিও পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আমরা আশা করছি।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

ISBN 984-70274-0000-7

গুনাহগার

(ইসলামিক উপন্যাস)

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশনায়

www.boighar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

গুনাহ্গার
শফীউদ্দীন সরদার
www.boighar.com
প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল-২০০৮

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বাসাপপ্র ১৪৪

প্রচ্ছদ
ফরিদী নূ'মান

মুদ্রক
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ১৪০.০০ টাকা মাত্র

www.boighar.com

Gunahgar
Written by **Shafiuddin Sarder**
Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410; 01711581255.
Price Tk.140.00 Only.
ISBN-984-70274-0000-7

BSP-144 -2008

গুনাহগার

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

গুনাহ্‌গার

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

১

আস্‌সালামু আলাইকুম!

ওয়ালাইকুমুস্‌ সালাম। যা বাব্বা!

এ আবার আর একজন নাকি?

জি? www.boighar.com

কৈ যান? এ দিকে যান কৈ?

আমি এই বাড়িতেই আসছি।

ক্যান? এই বাড়িতেই ক্যান্‌?

একজন নাকি শিক্ষক দরকার আছে এখানে? মানে...?

মানে, হুজুর? হুঁ, ঠিক ধরেছি। দেখেই বুঝেছি আপনি একজন হুজুর। আম্মাজান, তিন নম্বর! তিন নম্বর!!

ভেতর থেকে এক তরুণী আওয়াজ দিলো, কে ডাকে? জামাল চাচা?

জামাল: জি জি, এদিকে তিন নম্বর।

তরুণী: তিন নম্বর! কি তিন নম্বর?

জামাল: হুজুর। ছেলে পড়ানোর হুজুর। আজকের হিসেবে তিন নম্বর।

যুবতী: উহ্‌! জ্বালিয়ে মারলো তো! আরো একজন এসেছে?

জামাল: তো আর বলছি কি? আরো একজন!

যুবতী: তাহলে এক কাজ করো তো চাচা? এখনি ইস্টিশানে গিয়ে ঐ বিজ্ঞাপনটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো! উহ্‌! কী বেয়াকুফীটাই না করেছি! আজ কয়েক দিন থেকে লাগাতার আসতেই আছে...তাও যদি প্রার্থীর পেটে এক ফোঁটা বিদ্যা থাকতো কারো! বিলকুল মাকাল ফল!

এই কথার জের ধরে জামাল মিয়া বললো, মাকাল ফল! সব মাকাল ফল। চোখ ধাঁধানো মাকাল ফল।

যুবতী: তার মানে? www.boighar.com

জামাল: মানে, এটা আসলেই মাকাল ফলের মতো।

একটা দ্যাখ্‌নেওয়ালা পোলা। প্যাটে বিদ্যা থাকুক আর না থাকুক, হালায় চেহারাখানা বাগাইছে একদম চিত্রনায়ক বরাবর।

তা যে বরাবর হয় হোক, তোমাকে যা বললাম তাই করে এসো। এখনি ইস্টিশানে যাও! www.boighar.com

আরে হালায়! ন্যাঠা হলো তো জব্বোর! যাবো তো, কিন্তুক এডারে ঠেকাইবো কে? আগে এসে এডারে ঠেকাও, তারপরে আমি যাচ্ছি।

এবার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তরুণীটি। বিশ-বাইশ বছরের এক যুবতী। সে এসে জামাল মিয়াকে অভিযোগ করে বললো, তা এ নিয়ে আমাকেই কেবল ডাকাডাকি করছো কেন, আব্বাজানকে খবর দিতে পারছো না?

ভাইজান তো সকাল থেকেই বাড়িতে নেই। তারে খবর দিবো কি কইরা? আর তা ছাড়া...!

তা ছাড়া?

ন্যাঠাডা তো বাঁধাইছো তুমি। ইস্টিশানে ঐ লোটিশটা তোমার কথাতেই লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ঝামেলা হলে হেডা তো অহন তোমারেই সামলাইতে অইবো।

বটে!

অতঃপর তরুণীটি আগন্তুকের সামনে এসে প্রশ্ন করলো, তোমার মানে আপনার নাম?

আগন্তুক বললো, জি, সালাউদ্দীন আহমদ।

তরুণী ফের প্রশ্ন করলো, এখানে এসেছেন কেন?

জবাবে সালাউদ্দীন বললো, স্টেশানে ওয়েটিং রুমের দেয়ালে যে বিজ্ঞাপন দেয়া আছে, সেই বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।

কি লেখা আছে ঐ বিজ্ঞাপনে? www.boighar.com

একজন মাইনর পাস গৃহশিক্ষক-কাম-বাজার সরকার এই বাড়িতে প্রয়োজন। ঐ বিজ্ঞাপন দেখেই এসেছি।

আপনি মাইনর, মানে ক্লাস সিক্‌স্‌, পাস করেছেন?

জি, করেছি।

আর বেশি পড়েননি?

বিস্মিত চোখে চেয়ে সালাউদ্দীন বললো, বেশি!

তরুণীটি বললো, বেশি মানে, ক্লাস সেভেন এইট এ রকম আর দুই এক ক্লাস পড়েননি?

সালাউদ্দীন আশ্বস্ত কণ্ঠে বললো, জি, তা পড়েছি।

এ বাড়িতে চঞ্চল প্রকৃতির দুটি ছেলে আছে। তাদের আপনি পড়াতে পারবেন?

www.boighar.com

জি, পারবো।

অংক, ইংরেজি, বাংলা অর্থাৎ সব সাবজেক্‌ট পড়াতে পারবেন?

জি, পারবো।

পারবেন? তারা কোন্ ক্লাসে পড়ে এটা না জেনেই বলছেন পারবেন? তারা যদি এইট নাইনের ছাত্র হয়?

তাহলে আপনারা মাইনর পাস শিক্ষক চাইতেন না! আই. এ., বি.এ. পাস শিক্ষক চাইতেন।

www.boighar.com

তীক্ষ্ণ হলো তরুণীটির দৃষ্টি। সালাউদ্দীনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললো, তাই? হুঁশ-বুদ্ধিটা তো বেশ টনটনে বলেই মনে হচ্ছে। একেবারেই মাকাল ফল বলা যাবে না জামাল চাচার মতো।

জি?

এটুকুতেই হবে না। আপনার বিদ্যার দৌড়টা যাচাই করে দেখে তবেই আপনাকে রাখা না রাখাটা সাব্যস্ত করা হবে।

যাচাই করে দেখবেন?

অবশ্যই। বেশ ভালোভাবেই যাচাই করে দেখা হবে। এ যাবত যারাই এই কাজটির জন্যে এসেছে, দেখলাম, তারা সবাই এক একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি। ক্লাস ওয়ান টু'তে পড়ানোর বিদ্যাটাও তাদের কারো নেই, অথচ পড়াতে হবে ক্লাস থ্রী-ফোরের ছেলেদের।

ও, আচ্ছা।

আগের প্রার্থীরা চাঁকর-নফরের কাজটাই হয়তো খুঁজছিল। এখানে বেতনটা বেশি দেখে পেটে নামমাত্র বিদ্যা নিয়েই শিক্ষক হতে এসেছিল।

বলেন কি!

হ্যাঁ তাই।

এরপর তরুণীটি জামাল মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো, যাও তো চাচা, পাশের বাড়ি থেকে হানিফ স্যারকে ডেকে আনো তো জলদি। আব্বাজান বাড়িতে নেই। চেহারা আর কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, ইনি একটু শক্ত ক্যানডিডেট্‌ই হবেন। হানিফ স্যার এসে এঁকে একটু বাজিয়ে-টাজিয়ে দেখুন তো!

জামাল মিয়া উৎসাহ ভরে বললো, হ্যা হ্যাঁ, ঠিক কইছো আম্মাজান। আগেরগুলা আইসা জবুথবু হইয়া থেকেছে। মুখ দিয়া কথাই বারায়নি তেমন।

এ মিয়া দেখ্তাছি বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কইতাছে শুরু থেক্যাই। হানিফ স্যারকে দিয়্যাই এডার চিকিৎসা করাইতে অইবো। আমি উনারে ডেকে আনছি অহনি।

দ্রুত পদে চলে গেল জামাল মিয়া। সালাউদ্দীন আহমদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, ঐ হানিফ স্যারটা কে?

তরুণীটি বললো, হানিফ মোহাম্মদ স্যার। আমাদের হাই স্কুলের ডাকসাইটে মাস্টার। পুরানো শিক্ষক। এই যে আমাদের এই বাড়ির পাশেই বাড়ি!

ও! তা উনাকে দিয়ে বাজিয়ে দেখবেন? আপনারা কেউ বাজাতে পারেন না?

পারি, আমিই পারি। কিন্তু চেহারা আর চাউনিতে অন্যদের চেয়ে আপনাকে একটু আলাদা রকম মনে হচ্ছে। তাই আপনার মোকাবেলায় একজন শক্ত ওঝা ডাকা ভালো। বিদ্যার সাথে সব দিকটাতো দেখতে হবে!

সালাউদ্দীন এবার স্মিত হাস্যে বললো, বাপ্রে!

আমাকে দেখেই আপনার এমন ধারণা হলো? একদম শক্ত ওঝা?

ভয় পাবেন না। শক্ত ওঝা হলেও কোন শক্ত প্রশ্ন উনি করবেন না। পড়াবেন তো থ্রী-ফোরের ছেলেদের! সেজন্যে উনি আপনার কাছে অধিক বিদ্যা চাইবেন না।

তা বিদ্যার যা হয়, তা হবে। দয়া করে কি বলবেন, বাজার সরকারের কাজটা কি হবে?

বাড়ির দৈনন্দিন বাজার-সওদা করতে হবে। অবশ্য সেজন্যে আমাদের বাড়ির চাকর কদম আলী সঙ্গে থাকবে আপনার। বাজারের ব্যাগ-থলে কদম আলীই টানবে। আপনাকে শুধু দামদর করে সওদাপাতি কিনতে হবে আর হিসেব করে তার দাম মিটিয়ে দিতে হবে।

ব্যস্! আর কিছু নয়?

আছে, আর কিছু কাজও আছে। প্রয়োজনে পোস্টাফিসে যেতে হবে, ব্যাংকে গিয়ে বিলপত্র পরিশোধ করে আসতে হবে, ইস্টিশানে গিয়ে

অতিরিক্ত কিছু খবরের কাগজ কিনে আনতে হবে মাঝে মাঝে —এই সব কাজ আর কি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। এসব কাজ মোটেই কঠিন হবে না আমার কাছে।

কিন্তু সে কথা তো পরে। ছেলে পড়ানোর কাজটা আপনার কাছে সহজ হলে তবেই আসবে অন্য কাজের কথা। আপনার বিদ্যার খবরটা আগে জানা আমাদের প্রয়োজন।

ইতিমধ্যেই জামাল মিয়ার সাথে এসে গেলেন হানিফ মোহাম্মদ সাহেব। এসেই তিনি তরুণীটিকে প্রশ্ন করলেন, কৈ জহুরা আম্মা, কে আবার এলো ছেলে পড়ানোর জন্যে?

তরুণীটির নাম জহুরা জেসমিন। সংক্ষেপে তাকে অনেকেই জহুরা বলে ডাকে। বলে, জহুরা বেগম। হানিফ মোহাম্মদ সাহেবের প্রশ্নের জবাবে জহুরা জেসমিন বললো, এই যে, এই লোক স্যার। আগেরগুলোর চেয়ে এটাকে বেশ স্মার্ট বলে মনে হচ্ছে!

সালাউদ্দীনের প্রতি আঙ্গুল তুললো জহুরা জেসমিন। হানিফ মোহাম্মদ সাহেব বললো, ও আচ্ছা। চেহারাটাও তো চার্মিং। বেশ হ্যান্ডসাম্ ছেলে!

এরপর হাত ইশারায় সালাউদ্দীনকে কাছে ডেকে হানিফ স্যার প্রশ্ন করলেন, তুমি মাইনর পাস করেছো? মানে ক্লাস সিক্স পাস করেছো?

সালাউদ্দীন আহমদ বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিলো, জি হ্যাঁ।

জহুরা জেসমিন সংগে সংগে বললো, ক্লাস সেভেন এইট পর্যন্তও নাকি এ পড়েছে স্যার!

হানিফ স্যার বললেন, তাই নাকি? তাহলে তো বেশ ভালোই।

হানিফ স্যার এবার সালাউদ্দীনকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। বললেন, আচ্ছা বলো তো, দুটি সংখ্যার যোগফল আর বিয়োগফল দেয়া থাকলে সংখ্যা দুটি কিভাবে বের করতে হবে।

সালাউদ্দীন ঐ একই রকম নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো, যোগফল আর বিয়োগফলকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ আর বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলেই সংখ্যা দুটি বেরিয়ে আসবে।

হানিফ স্যার খোশ কণ্ঠে বললো, বাহ্! সঠিক উত্তর দিয়েছো তো! এবার বলো দেখি, ভাজক, ভাগফল আর অবশিষ্ট দেয়া থাকলে ভাজ্য কিভাবে বের করবে?

সালাউদ্দীন বললো, ভাজক দিয়ে ভাগফলকে গুণ করে অবশিষ্ট যোগ করলেই ভাজ্য বেরিয়ে আসবে।

হানিফ স্যার এবার উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, সাব্বাস!

এবার একটা শক্ত প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। পাঁচ অঙ্কের সব চেয়ে বড় সংখ্যা লিখতে বললে কী লিখবে আর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা লিখতে বললে কী লিখবে?

জবাবে সালাউদ্দীন বললো, পাশাপাশি পাঁচটি ৯ (নয়) লিখলেই পাঁচ অংকের সবচেয়ে বড় সংখ্যা হবে আর ১ (এক) লেখার পর তার ডাইনে চারটে ০(শূন্য) বসালেই পাঁচ অংকের সব চেয়ে ছোট সংখ্যা হবে।

হানিফ স্যার আরো অধিক উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, মারহাবা, মারহাবা! অংকের ওপর তোমার দখলটা তো বেশ শক্তই আছে দেখছি। অন্য সাব্‌জেক্‌টগুলোর ওপর তোমার দখল কেমন, সেটা তো দেখতে হয়। হানিফ মোহাম্মদ সাহেব এবার একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন আর সেকেন্ড কয়েক থেমে থেমে সালাউদ্দীন তার উত্তর দিয়ে যেতে লাগলো।

হানিফ মোহাম্মদ: সন্ধি বিচ্ছেদ করো তো, স্বাগত।

সালাউদ্দীন: সু+আগত।

হানিফ মোহাম্মদ: ইত্যাদি?

সালাউদ্দীন: ইতি+আদি।

'থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে'-এ কবিতা কে লিখেছেন?

কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কোন্ কথাটা শুদ্ধ—বদ্ধপরিঘর, না বদ্ধপরিকর?

বদ্ধপরিকর।

যথেষ্ট, না যথেষ্ঠ?

যথেষ্ট।

'সে খেলা করে' এর ইংরেজি কি?

He plays.

'সে ফুটবল খেলিতেছে' ইংরেজি কি?

He is playing football.

'আজ বড় গরম'-এর ইংরেজি বলো?

It is very hot today

'এক দেশে এক রাজা ছিল্ এর ইংরেজি?

There was a king in a country.

'বনে বাঘ আছে'

There are tigers in the forest.

প্রণালী কাকে বলে?

যে ক্ষুদ্র জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে যোগ করে তাকে প্রণালী বলে। যেমন পক্ প্রণালী।

অন্তরীপ কাকে বলে?

যে স্থলভাগ ক্রমশ সরু হয়ে সাগরে প্রবেশ করে তার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ। যেমন কুমারিকা অন্তরীপ।

হজরত মুহম্মদ স. কত খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

৫৭০ খৃস্টাব্দে।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কত খৃস্টাব্দে সংঘটিত হয় আর কার কার মধ্যে তা সংঘটিত হয়?

১৫২৬ খৃস্টাব্দে আর সংঘটিত হয় মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আর রাণা সংগ্রাম সিংহের মধ্যে।

হানিফ মোহাম্মদ সাহেব এবার কয়েক ফুট্ শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন এবং চিৎকার করে বললেন, হাফেজ, একদম হাফেজ! সকল সাব্জেকটে জ্ঞান এর অসাধারণ। সব সাব্জেকেটর ওপর এ কি আশ্চর্য এর দখল! কী করে এটা হলো! এমন তালিম তুমি কোথায় পেলে?

সালাউদ্দীনের দিকে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে প্রশ্ন করলেন হানিফ মোহাম্মদ সাহেব। জবাবে সালাউদ্দীন বললো, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, মানে ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্যে আমার স্যারেরা আমাকে এভাবেই তালিম দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে বৃত্তি পরীক্ষাটা আর দেয়া হয়নি। সালাউদ্দীনের কণ্ঠস্বর শেষের দিকে ক্ষীণ হলো।

হানিফ মোহাম্মদ সাহেব ফের উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, দিলে বৃত্তিটা ছিল তোমার জন্যে লাঠির আগায় বাঁধা। তা এত তোমার জ্ঞানগম্মী, লেখাপড়া ছেড়ে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে সালাউদ্দীন বললো, পেটের সমস্যা বড় সমস্যা স্যার। সেটা মেটানোর আগে কি অন্য চিন্তা করা যায়?

সে কি! তোমার আব্বা আম্মা নেই?

জি না স্যার। আমার আব্বা-আম্মা, ভাইবোন কেউ নেই।

তাহলে থাকো কোথায়?

আমার গ্রামেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আমার ভিটে-মাটিসহ সামান্য কিছু জমিজমা আমার ঐ আত্মীয়ের মধ্যেই আছে আর ছোটকাল থেকে আমি তার কাছেই আছি। www.boighar.com

হানিফ স্যার ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, স্যাড, স্যাড! ভেরি স্যাড্। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, তোমার চালচুলা তেমন কিছুই নেই।

অনেকটা তাই স্যার। আমার নিজের কোন ঘরবাড়ি নেই।

হানিফ মোহাম্মদ সাহেব এবার চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, এইটেই তো এখন তাহলে মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো ইয়ংম্যান। তোমার যা পাণ্ডিত্য, তাতে থ্রী-ফোর কেন, সেভেন-এইটের ছেলেদেরও পড়ানোর হিম্মত আছে। কিন্তু চালচুলাহীন তুমি একজন ভবঘুরে। হারিয়ে পালিয়ে গেলে তোমার তো হদিস করা যাবে না।

সালাউদ্দীন সহাস্যে বললো, কি যে বলেন স্যার! ভিটেয় আমার ঘর নয়, তাহলে কি হবে, গাঁয়ে আমার ভিটে-মাটি আর কিছু জমিজমা তো আছে। ঐ সব জমিজমা নিয়ে গাঁয়ে ঐ আত্মীয়ের বাড়িতে আমি বাল্যকাল থেকে আছি। ঐটেই আমার পাকাপোক্ত ঠিকানা। আমার হদিস পাওয়া যাবে না কেন?

তবু অসুবিধে আছে। তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ। রাখতেও আমরা আগ্রহী। কিন্তু তুমি একেবারেই একজন অজানা-অচেনা মানুষ। দায়িত্বপূর্ণ কোন কেউ সার্টিফাই না করলে এভাবে তো আমরা রাখতে পারিনে তোমাকে। কি বলো জহুরা আম্মা?

জহুরা জেসমিনের সমর্থন চাইলেন হানিফ মোহাম্মদ সাহেব। জহুরা জেসমিন আম্‌তা আম্‌তা করে বললো, না স্যার, একেবারেই যে রাখতে পারিনে তা নয়। ইনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাই আমার কথা হলো, ইনি আপাতত থাকুন আমাদের এখানে। খোঁজ-খবর করে দেখার পরে পরিস্থিতি অনুযায়ী ইনাকে রাখা না রাখা ফাইনাল করা যাবে।

সালাউদ্দীন বললো, খোঁজ-খবর করতে চাইলে আপনাদের বেশি দূরে যেতে হবে না। আপনাদের এই থানার ওসি মানে বড় দারোগা সাহেব আমার একবারেই পাশের গাঁয়ের লোক। উনি আমার সব খবরই জানেন। দূর দিকে উনি আমাদের কিছুটা আত্মীয়ও বটেই! আপনারা তাঁর কাছে খোঁজ করুন, শক্ত সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন।

হানিফ স্যারের মুখ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, সেকি! আমাদের ও.সি. সাহেব তোমার পরিচিত লোক! সোবহান আল্লাহ! থানার লোকের পরিচিত লোক হলে তো আর কোন চিন্তাই থাকে না আমাদের থানার লোক সার্টিফাই করলে কি আর তার চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আছে?

সালাউদ্দীন বললো, তাহলে সেখানেই গিয়ে খোঁজ নিন। আশা করি আর কোন চিন্তাই থাকবে না আপনাদের।

তাই করা হলো। থানায় গেলে ওসি সাহেব হৃষ্ট কণ্ঠে বললেন, সালাউদ্দীন আর আমি মানে আমরা এক জায়গার লোক। সে আমার দূর সম্পর্কের কিছুটা আত্মীয়ও বটে। সালাউদ্দীন বড়ই সচ্চরিত্রের ছেলে। মেধাবীও খুব। আমি চেয়েছিলাম সে যদি গৃহশিক্ষকের বা গৃহের কাজ করতে চায়, আমাদের এই থানাতে মানে থানার কোন লোকের বাড়িতে তার মতো ছেলের চাহিদা আছে খুব। কিন্তু সালাউদ্দীন একেবারেই এক অন্য ধাতের ছেলে। থানা-পুলিশের পরিবেশ তার ভালো লাগলো না আদৌ। সে চায় মুক্ত আর খোলামেলা জীবন। আপনাদের ওখানে সে ভালোই থাকবে। আপনারা নিশ্চিন্তে রাখতে পারেন তাকে।

এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কি হতে পারে?

জহুরা ইয়াস্‌মিনদের বাড়িতে গৃহশিক্ষক-কাম-বাজার সরকার হিসাবে সালাউদ্দীনকেই সাগ্রহে নিয়োগ দেয়া হলো।

সালাউদ্দীনকে নিয়োগ দিয়ে বাড়িতে রাখার ফলে সেবাড়ির অনেকেই খুশি প্রকাশ করলেও যারপরনাই নাখোশ হলেন বাড়ির মালিক তথা জহুরা জেসমিনের আব্বা মীর আফসারউদ্দীন সাহেব। তিনি পুরানো দিনের রক্ষণশীল লোক। বাইরের কোন ছেলে ছোক্‌রা, বিশেষ করে নব্যযুবক বাড়িতে ঢুকুক এটা একেবারেই তাঁর না-পছন্দ। তাঁর মতে হাল আমলের যুবক সম্প্রদায় মানেই একেবারেই একটা বখে যাওয়া সম্প্রদায়। তাদের শতকরা নিরানব্বই জনই পুরোপুরি নষ্ট মানুষ। দায়িত্বহীন-চরিত্রহীন ও উচ্ছৃঙ্খল লোক। নেশাখোর আর নচ্ছারের দল। এরা করতে পারে না এমন হীন কাজ নেই।

কাজেই সালাউদ্দীনকে চাকুরী দিয়ে এ বাড়িতে ঢোকানোর কারণে খুবই নাখোশ হলেন মীর আফসারউদ্দীন সাহেব। প্রতিবাদ করে পরাস্ত হয়ে তিনি হুকুম জারি করলেন, বাহির বাড়ির সীমানা পেরিয়ে সে যেন

বইঘর.কম ও রোকন

কখনই ভেতর বাড়িতে পা না রাখে! তা রাখলে শুধু সালাউদ্দীনকেই নয়, সালাউদ্দীনের সমর্থক সকলকেই তিনি এ গৃহ থেকে বহিষ্কার করবেন। এটা তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত। তাঁর এ সিদ্ধান্তে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না।

কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস! কয়েকটা দিন না যেতেই মীর আফসারউদ্দীন সাহেব ফের মাঝে মাঝেই হাঁকতে লাগলেন, কৈ সালাউদ্দীন! করে কি? তাকে জলদি জলদি বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দাও। এখন আমি বাইরে যেতে পারছিনে, সে-ই ভেতরে আসুক।

ঘটনা চিরাচরিত। সালাউদ্দীন একজন খুবই পরহেজগার ছেলে। ইসলামের তামাম হুকুম-আহ্‌কাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলে সে আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে নিষ্ঠার সাথে। শুধু একা একাই নামাজ আদায় করে না, এ বাড়িতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই সে এ বাড়ির কয়েকজনকে, বিশেষ করে জামাল মিয়া আর বাড়ির চাকর কদম আলীকে
www.boighar.com
অনেকটাই নামাজমুখী করে তুলেছে। সামনে পেলেই সে তাদের ডেকে নিয়ে বাহির বাড়িতে তার থাকার ঘরের বারান্দায় জামাত করে নামাজ আদায় করে। প্রথম প্রথম এরা পাশ কাটিয়ে যেতো। কিন্তু সালাউদ্দীনের নসিহতে আর একাগ্রতায় জামাল মিয়া, কদম আলীরা এখন নামাজ আদায়ে অনেকটাই রেগুলার হয়ে উঠেছে। নামাজের ওয়াক্ত হলেই এখন তারা এসে ঘুর ঘুর করে সালাউদ্দীনের বারান্দার আশেপাশে আর সালাউদ্দীন তাদের সাগ্রহে ডেকে নিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে।

এ দৃশ্য দেখলে খুশি হয় না নামাজপ্রিয় এমন ব্যক্তি কে আছে এই দুনিয়ায়? মীর আফসারউদ্দীন সাহেবের মতো সার্বক্ষণিকভাবে নামাজ-রোজা ও এবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকা ব্যক্তি এ দৃশ্য দেখে যে খুশিতে বাগেবাগ হয়ে যাবেন, এ আর বিচিত্র কি!

মীর সাহেব নামাজ আদায় করেন বাড়ির মধ্যে এক পৃথক ঘরে। এই পৃথক ঘরেই এখন তিনি বাস করেন। মূল ঘরের হৈ চৈ আর ঝুট-ঝামেলা এখন আর তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। এই পৃথক ঘরে কখনও ভেতরে আর কখনও বারান্দায় জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ আদায় করেন তিনি। আজ পর্যন্ত বড় একটা কাউকেই তিনি তাঁর নামাজের নিয়মিত সঙ্গী বানাতে পারেননি। তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই ঢাকাইয়া জামাল মিয়াকে মাঝে মাঝে ধরে এনে পাশে দাঁড় করালেও হর ওয়াক্তেই নামাজের সময়

তিনি নাগাল পান না জামাল মিয়ার। নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই সে কেটে পড়ে মীর সাহেবের নাগাল থেকে। সেই জামাল মিয়া এখন নামাজে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে! এ খবর মীর সাহেবের কাছে একটা তাজ্জব খবর বই কি!

বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি শুনছেন, নতুন গৃহশিক্ষক সালাউদ্দীন একজন নামাজী লোক। তার ঘরে সে নিয়মিত নামাজ আদায় করে। ইদানিং তিনি শুনছেন, সালাউদ্দীন একা একাই নামাজ আদায় করে না, জামাত করে নামাজ আদায় করে আর তার জামাতের নিয়মিত মোক্তাদি জামাল মিয়া আর কদম আলী। কখনো কখনো বাড়ির অন্য দুই একজন চাকর-বাকর, এমনকি দু'একজন পড়শীও সে জামাতে শরিক হয়, এখবরও মীর সাহেবের কানে পড়ছে ইদানিং। এরপরে কি মীর সাহেব আর উৎসাহী না হয়ে পারেন?

একদিন মাগরিব নামাজের ওয়াক্তে মীর সাহেব ঘটনাটা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে এলেন এবং নিজেকে অনেকটা আড়াল করে সালাউদ্দীনের ঘরের দিকে চুপি চুপি এগুলেন। কিছুটা এগিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, সালাউদ্দীনের ঘরের বারান্দায় মাগরিব নামাজের জামাত শুরু হয়ে গেছে। ইমাম হয়ে দাঁড়িয়েছে সালাউদ্দীন আর তার পেছনে মোক্তাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে জামাল মিয়া আর কদম আলীসহ বহিরাগত আরো দুই তিনজন লোক। মোক্তাদির কাতারের মধ্যভাগে ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে জামাল মিয়া আকামত দিচ্ছে উচ্চ কণ্ঠে।

দেখে খুশিতে দুলে উঠলেন মীর সাহেব। তিনি অজু করেই এসেছিলেন। কালবিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে ঐ মোক্তাদিদের কাতারের এক পাশে দাঁড়ালেন। নিয়্যত অন্তে এরই মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত নিয়্যত করে মীর সাহেব নামাজে শরিক হলেন ইমামের পেছনে। অত:পর তিনি আরো অধিক মুগ্ধ হলেন সালাউদ্দীনের কেরাত শুনে। যেমনই শুদ্ধ উচ্চারণ তেমনই সুললিত কণ্ঠ! এই ছেলেকে তিনি বাড়িতে ঠাঁই দিতে চাননি, এ কথা মনে আসতেই নিজে লজ্জিত হলেন নিজের কাছে।

শেষ হলো নামাজ। সালাম ফেরানোর পরে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত অন্তে সালাউদ্দীন পেছনে সরে এলো সুন্নত নামাজ আদায় করার জন্যে। মোক্তাদিদের কাতারে এসে দাঁড়াতেই মীর সাহেবকে কাতারে দেখে

চমকে উঠলো সে। জড়সড় হয়ে সে অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে মীর সাহেবকে বললো, এ কি হুজুর, আপনি! আপনি মোক্তাদিদের কাতারে আর ইমামতি করলাম আমি! তওবা, তওবা! এ কি গুনাহ্‌গার করলেন আমাকে হুজুর? আপনি এসেছেন, একটু জানান দিলেই আপনার জন্যে ইমামের জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমি মোক্তাদির কাতারে এসে দাঁড়াতাম।

কাছে এসে সালাউদ্দীনের পিঠ চাপড়িয়ে মীর সাহেব বললেন, নারে বাপজান, গুনাহগার হবে কেন? যে সুন্দর আর শুদ্ধ উচ্চারণ তোমার, তাতে ইমামতি করাটা তোমাকেই মানায়।

সালাউদ্দীন আপত্তি তুলে বললো, না হুজুর, আপনার মতো মুরুব্বী আর মানী-গুণী লোককে পেছনে রেখে আমার মতো ছেলে-মানুষ ইমামের আসনে দাঁড়ানো মানেই মুরুব্বী আর মানী লোকদের অপমানিত করা।

মীর সাহেব বললেন, কী যে বলো বাপজান! তুমি কি শোননি, একজন ফকির ইমামের আসনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করলেও একজন বাদশাহ তার পেছনে হৃষ্টচিত্তে নামাজ আদায় করেন। বাদশাহর তাতে মান-সম্মান বাড়ে বই এক তিলও কমে না।

হুজুর!

নওজোয়ান! ইসলামে কোন ছোট-বড় ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান, বিশেষ করে নামাজের বেলায় তা আদৌ নেই।

এরপর থেকেই পাল্টে গেল পরিস্থিতি। প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজে মীর আফসারউদ্দীন সাহেব বাহির বাড়িতে চলে আসেন আর সবার সাথে জামাত করে নামাজ আদায় করেন। সালাউদ্দীন ইমামতি করুক, মীর সাহেব তা মনে-প্রাণে চাইলেও সালাউদ্দীন নাছোড়বান্দা। তার পীড়াপীড়ির ফলে বাধ্য হয়েই ইমামতি করেন মীর সাহেব আর আকামত দেয় সালাউদ্দীন।

এভাবেই প্রায় ওয়াক্ত কাটে। কিন্তু মীর সাহেব বৃদ্ধ মানুষ। মাঝে মাঝে খারাপ হয় তার শরীর। শরীর খারাপ হলে তিনি বাইরে আসতে পারেন না। ঘরেই তাকে নামাজ আদায় করতে হয়। তখন তিনি হাঁকাহাঁকি শুরু করেন, কৈরে সালাউদ্দীন করে কি? তাকে জলদি জলদি ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আমি আজ বাইরে যেতে পারবো না। সালাউদ্দীন এসে আমার সাথে নামাজ আদায় করুক! বাইরে অন্যেরা নামাজ আদায় করুক জামাল মিয়ার পেছনে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই জামাল মিয়া ঠেকা চালানোর মতো ইমামতি করার বিদ্যা ও কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

www.boighar.com

২

গৃহশিক্ষক-কাম-বাজার সরকার পদে সালাউদ্দীনকে নিয়োগ দানের ব্যাপারে জহুরা জেসমিনের আগ্রহই ছিল বেশি। কিন্তু নিয়োগ দানের পরে জহুরা জেসমিনই বিড়ম্বনায় পড়লো বেশি। উঠতি বয়সের সুদর্শন এই গৃহশিক্ষককে গৃহে স্থান দেয়ার ফলে জহুরা জেসমিনের জন্যেই সৃষ্টি হলো এক আপদ। বাড়িতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা তার বিঘ্নিত হয়ে গেল। মেধাবী আর নামাজী হলেও সালাউদ্দীন এক নব্যযুবক ও তরতাজা তরুণ! তরুণীদের প্রতি তরুণদের স্বভাবজাত আকষণ সালাউদ্দীনের মধ্যে থাকবে না এটা মোটেই কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়, বিশেষ করে অত্যন্ত রূপসী বলে জহুরা জেসমিনের খ্যাতি আছে দুর্দান্ত। সবার মুখে শুনে শুনে জহুরা জেসমিন নিজেও এখন বিশ্বাস করে, সে একজন রূপবতী মেয়ে। সুতরাং, নজরে পড়লেই যে তার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকবে সালাউদ্দীন, এটাই স্বাভাবিক। বয়সের ধর্মকে উপেক্ষা করতে অনেক সময় সন্ন্যাসীরাও পারে না। যৌবনের আবেগ-আচরণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সালাউদ্দীন নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ কেউ নয়। ফলে সালাউদ্দীনের পক্ষেও তা সম্ভব হবে না। সুযোগ পেলেই সালাউদ্দীন আকৃষ্ট হবে তার প্রতি আর তার তরফ থেকে কিঞ্চিৎ সাড়া পাওয়া মাত্রই সালাউদ্দীনের সে আকর্ষণ উত্তাল হয়ে উঠবে। যৌবনের ধর্মের কাছে স্থান-কাল-পাত্র সবই গৌণ হয়ে যাবে।

এ সব কিছু বুঝে জহুরা জেসমিন প্রথম থেকেই সতর্ক হলো এবং সালাউদ্দীনের নাগাল ও সংস্রব এড়িয়ে চলতে লাগলো।

কিন্তু একই সাথে একই বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে গেলে একে অন্যের সংস্রব একেবারেই এড়িয়ে চলা অসম্ভব। কোন না কোন কারণে একেক অন্যের সামনে এসে পড়তে হয় আর আসতে হয়। নানা প্রয়োজনে

বইঘর.কম ও রোকন

জহুরা জেসমিন বাহির বাড়িতে আসে আর কথা বলে চাকর-নফর ও অন্যদের সাথে। জরুরী প্রয়োজনে অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলতে হয় তাকে এবং থাকতে হয় বাহির বাড়িতে। এসব ক্ষেত্রের অনেক সময়ই সালাউদ্দীনের সরাসরি দৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করে সে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবিষ্কার করতে না পারলেও অনেকক্ষণ পরে সেটা আবিষ্কার করামাত্রই জহুরা জেসমিন চমকে ওঠে আর দ্রুত পদে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সন্ধানী নজর দিয়ে সে যদি লক্ষ করতো, তাহলে দেখতে পেতো ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকা তো দূরের কথা, তার এই দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের মধ্যে চোখ তুলে তার দিকে একবারও তাকায়নি সালাউদ্দীন। সে তাকায়ও না কোন সময়।

কিন্তু এর পরেও থেকে যায় কথা। পালিয়ে বাঁচতে চাইলেও সব সময় পালিয়ে বাঁচা যায় না। অপরিহার্য প্রয়োজনে তাকে আসতে হয় সালাউদ্দীনের সামনে আর কথা বলতে হয় তার সাথে। এই অপরিহার্য প্রয়োজনের একটা হলো, তার ছোট দুই ভাই আফাজ ও হাফিজের অর্থাৎ সালাউদ্দীনের দুই ছাত্রের পড়াশোনার খোঁজ-খবর করা আর দ্বিতীয়টি হলো বাজারে যাওয়ার সময় বাজার ফর্দ আর টাকা-পয়সা সালাউদ্দীনকে বুঝিয়ে দেয়া। স্কুল কলেজ ছেড়ে এসে যখনই জহুরা জেসমিন বাড়িতে থাকে, তখনই এ দায়িত্ব এসে তার ঘাড়ে পড়ে। এবারও তাই পড়েছে।

বৃদ্ধ বাপ থাকেন এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে নিজের ঘরে আবদ্ধ। আর বাতের রোগী আম্মা থাকেন চব্বিশ ঘন্টার বারো ঘন্টাই বিছানায়। বাজারের ঝুট-ঝামেলার দিকে নজর দেয়ার অবকাশ তার বড় একটুও থাকে না। বাজার সরকার নিয়োগ করার আগে আর জহুরা জেসমিনের অনুপস্থিতির কালে এ দায়িত্ব পালন করতো কম হুশ-বুদ্ধির লোক জামাল মিয়া।

জামাল মিয়ার আদি বাস ঢাকায়। সে মীর সাহেবের দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই অর্থাৎ মীর সাহেবের মামার সম্বন্ধীর ছেলে। মাতা-পিতা হারিয়ে জামাল মিয়া বাল্যকাল থেকেই তার ফুফার অর্থাৎ মীর সাহেবের মামার বাড়িতে মানুষ হয়। মীর সাহেবের মামাও তাকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ভর্তি করেন স্কুলে। কিন্তু জামাল মিয়ার হুঁশ-বুদ্ধি জন্মলগ্ন থেকেই অনেক কম। মেধা আরো কম। এতে করে অতি কষ্টে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিক্ষা দানের পরে জামাল মিয়ার

শিক্ষকেরা হালটা ছেড়ে দিলেন পুরোপুরি। তারা মীর সাহেবের মামাকে ডেকে পরামর্শ দিলেন, বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার অপচেষ্টা বাদ দিয়ে জামালকে সাংসারিক কাজ কর্মের তালিম দিলে তার উপকার করা হবে ঢের ঢের বেশি। কারণ জামাল মিয়ার দ্বারা বিদ্যা অর্জন কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

সেই থেকেই শেষ হয় জামাল মিয়ার পড়াশোনা। কিন্তু অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী—এ কথাটা আদি কাল থেকেই স্বীকৃত। এই অল্পবিদ্যাকে অঢেল বিদ্যারূপে জাহির করতে গিয়ে সে কপাল পুড়িয়েছে নিজের। মীর সাহেবের মামার নিজের ছেলেদের এতে করে কোপ নজরে পড়ে জামাল মিয়াও। তাদের বিদ্রূপে আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মীর সাহেবের মামার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জামাল মিয়া অবশেষে চলে আসে এই মীর সাহেবের বাড়িতে। স্থান আর লোকজনদের ভালো লাগায় আর এখানে তাকে বিদ্রূপ আর অত্যাচার করার কেউ না থাকায় জামাল মিয়া অত:পর হৃষ্টচিত্তে এই মীর সাহেবের বাড়িতেই খুঁটি গেড়ে বসে যায়।

সে আজ প্রায় পনের বিশ বছর আগের কথা। সেই থেকেই সে এ বাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে তার ঐ বিদ্যা জাহির করার বদ অভ্যেসটা বাদ দিলে মানুষ হিসেবে জামাল মিয়া খুবই ভালো মানুষ। অত্যন্ত সরল আর সৎ। কপটতার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। মীর বাড়ির সবার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সুগভীর। এ বাড়ির স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বদাই সে পণ করে মরণকে। তার চোখের সামনে এ বাড়ির পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। এমতাবস্থায় এ বাড়ির সবাই তাকে ভালো না বেসে পারে কি করে? সবাই তাকে ভালোবাসে। তার হাত ছাঁদতে বড় একটা কেউ যায় না। তার পাগ্‌লামীটুকুকে এখন সবাই হাসির খোরাক হিসেবেই উপভোগ করে। ফলে সেই থেকেই জামাল মিয়া এ বাড়িতে আছে আর দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথেই আছে। জহুরা জেসমিনের অনুপস্থিতির সময় আর বাজার সরকার নিয়োগ দেয়ার আগে এই জামাল মিয়াই সম্পন্ন করতো বাজার-সওদার কাজ। সম্পন্ন করার বদলে এই কাজটা সে প্রতিদিনই অসম্পন্ন করে বসতো, এইটে বলাই বেহতর। কারণ একবারের জায়গায় পাঁচবার পর্যন্ত বাজারে গিয়েও সে সমুদয় বাজার-সওদা ঠিক ঠিক বুঝে আনতে পারতো না। বাতের রোগী জহুরা জেসমিনের আম্মা বাজারের যে ফর্দ করে দিতো, সে ফর্দ উড়ে যেতো জামাল মিয়ার বাজারে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। কোথায় সেটা হারিয়ে যেতো জামাল মিয়া তার

দিশে করতেই পারতো না। ফলে যে সব সওদা দরকার তার অনেক কিছুই পড়ে থাকতো বাজারে আর যেগুলোর দরকার নেই, এমন অনেক সওদাই জামাল মিয়া কিনে আনতো খুঁজে খুঁজে। বাড়িতে এসে বকুনি খেয়ে জামাল মিয়া আবার দৌড়ে যেতো বাজারে ঐ না-আনা জিনিসগুলো আনার জন্যে। কোন কোন দিন জামাল মিয়া এমন দৌড় চার-পাঁচবারও দৌড়াতো। তবে এতে সে কোনই ক্লান্তি বোধ করতো না বা নারাজ-নাখোশও হতো না। আর টাকা-পয়সার হিসাব? অল্প বিদ্যা দিয়ে সে যতই কোশেশ করুক, প্রতিদিন পাঁচ-দশ টাকা গচ্ছা দিয়ে আসাটা সে কিছুতেই রোধ করতে পারতো না।

এ অবস্থায় এখন বাড়িতে এসেছে মাইনে করা বাজার সরকার আর লম্বা ছুটিতে এখন বাড়িতে রয়েছে জহুরা জেসমিন। এতে করে বাতের রোগী আম্মার বদলে বাজারের দিকটা এখন সামাল দিতে হচ্ছে জহুরা জেসমিনকেই অর্থাৎ সালাউদ্দীনের বাজারের ফর্দ ও টাকা-পয়সা বুঝে দেয়া আর বাজার অন্তে বাজার-সওদাসহ খরচের হিসাবটা বুঝে নেয়ার কাজটা করতে হচ্ছে তাকেই।

সেদিন অনেক বেলা হয়ে যাওয়ার পরও বাজার করার কোন উদ্যোগ নেয়া হলো না। ফর্দ লিখে নিয়ে জহুরা জেসমিন কদম আলী ও সালাউদ্দীনের অপেক্ষায় রইলো। তরতর করে বাড়তে লাগলো বেলা। টাকা-পয়সা বুঝে নিতে তখনও কেউ এলো না। অবশ্য প্রাথমিকভাবে এ কাজটা বাড়ির চাকর কদম আলীই করে। ফর্দ তৈরি করার পরে জহুরা জেসমিন কদম আলীকে তলব দেয় আর কদম আলীর মারফত ফর্দ ও টাকা-পয়সা বুঝে নিতে ডেকে আনে সালাউদ্দীনকে।

আজ তাদের কারো পাত্তা নেই। অপেক্ষা করে করে জহুরা জেসমিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বাড়ির ভেতরে কাউকে কোথাও না পেয়ে কদম আলী ও সালাউদ্দীনের খোঁজে এবার সে ক্ষিপ্ত পদবিক্ষেপে বাড়ির বাইরে আসতে লাগলো।

ভেতর বাড়ি থেকে বাহির বাড়িতে আসতে গেলে করিডোরের মতো একটা গলি পথ পেরিয়ে বাহির বাড়িতে আসতে হয় অর্থাৎ বাড়ির পুব ভিটেয় পাশাপাশি ও লম্বালম্বি দুটি বাইরের ঘর থাকায় এই দুই ঘরের মাঝখানে তৈরি হয়েছে এই করিডোর বা গলি পথ। বাইরে আসার আরো কিছু ছোট খাটো পথ থাকলেও এই করিডোরটাই প্রধান পথ। করিডোরটা

পার হয়ে এলে সামনে পড়ে বাহির আঙ্গিনা। হাতের ডাইনে যে ঘরটি পড়ে সেটা সাজানো গোছানো বৈঠকখানা। বাম পাশের ঘরটি দুকক্ষে বিভক্ত। এক কক্ষ ছেলেদের পড়ার ঘর আর অপর কক্ষ সালাউদ্দীনের থাকার ঘর।

করিডোর পার হয়ে এসে বাহির আঙ্গিনায় পা দিলেই হাতের ডাইনে-বাঁয়ে টবে রাখা কয়েকটা পাতা বাহারের ঝাড়। বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে করিডোরের মাথায় দুদিকে দুটি করে পাতা বাহারের বড় বড় ঝাড় স্থাপন করা হয়েছে। টবে রাখা হলেও নিয়মিত পরিচর্যার কারণে ঝাড়গুলো বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। ডাল গজিয়েছে বড় বড়, পাতা গজিয়েছে প্রচুর।

করিডোর পার হয়ে বাহির আঙ্গিনায় আসতেই জহুরা জেসমিনের নজরে পড়লো বাম পাশের ঝাড়গুলো ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কে একজন! দেখেই তার মনে হলো লোকটি কদম আলী। এটি মনে হওয়ার সাথে সাথে জ্বলে উঠলো জহুরা জেসমিনের শরীর। সে সক্রোধে বললো, বা-বা-বা! এই যে হুজুর বাহাদুর এখানে? তুমি এখানে এসে হাওয়া খাচ্ছো? সালাউদ্দীন মিয়াকে ডাকতে এসেছো নিশ্চয়ই? আর ডাকতে এসে গাটা এলিয়ে দিয়েছো বাতাসে? তা কোথায় সে? কোথায় সেই সালাউদ্দীন মিয়া? বেলা দুপুর হয়ে গেল, তবু খোঁজ পাওনি তার? ভেবেছে কী লোকটা! ছেলে পড়ানোর সাথে বাজার করার জন্যেই রাখা হয়েছে তাকে। সে কি ভেবেছে, বাজার করার কাজটা না করলেও আমরা তাকে জামাই আদরে রাখবো? বসে বসে খাওয়াবো আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে দেবো? কোথায় গেল সালাউদ্দীন মিয়া? যেখানে থেকে হোক তাকে খুঁজে আনো। আজ চরম কথা শুনিয়ে দেবো তাকে। যাও, কোথায় গেল সে, খুঁজে আনো জলদি...।

ভাল করে না দেখেই এক তরফাভাবে বকে গেল জহুরা জেসমিন। তার এই ঝড়ের মুখে পাতাবাহারের ঝাড়ের আড়লে দাঁড়ানো লোকটা কোন সুযোগই পেলো না কথা বলার। জহুরা জেসমিন থামলে এবার ঐ আড়াল থেকে জবাব এলো, আমি কোথাও যাইনি মেম সাহেব। কদম আলীর অপেক্ষায় আমি এই ভেতরে যাওয়ার রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে আছি। বিনে ডাকে তো আর বাড়ির ভেতরে যেতে পারিনে, তাই প্রায় প্রহরখানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছি এখানে। কিন্তু কদম আলীর কোন

বইঘর.কম ও রোকন

সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে। অন্য দিন তো এর অনেক আগেই আমাকে ডাকতে আসে কদম আলী।

বাঘ দেখারও অধিক চমকে উঠলো জহুরা জেসমিন। ভালো করে চেয়ে কদম আলীর বদলে সেখানে সালাউদ্দীনকে দেখামাত্র লজ্জায় কুঁক্‌ড়ে গেল সে। 'ওমা! আপনি, মানে তুমি?' বলে একটা আওয়াজ দিয়েই পড়ি মরি বাড়ির ভেতরে দৌড় দিলো জহুরা জেসমিন।

কদম আলী তখন বাড়িতেই ছিল না, বাড়ির মালিক মীর সাহেব সকল বেলা কদম আলীকে কি এক কাজে ওপাড়ায় পাঠিয়েছিলেন। কাজ সেরে কদম আলী যথাসময়ে ফিরে আসতে পারেনি। কাজ শেষ না হওয়ায় কদম আলী আটকে ছিল ওপাড়াতেই। যখন সে ফিরে এলো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে আর জামাল মিয়ার হাত থেকে বাজারের ফর্দ ও টাকা-পয়সা বুঝে নিয়ে সালাউদ্দীন মিয়া বাজারে গেছে একাই।

বাজার করে এসে সালাউদ্দীন বাজার সওদা ও টাকা-পয়সা জহুরা জেসমিনকে বুঝিয়ে দিতে এলো। না বুঝে সালাউদ্দীনকে অতগুলো অপ্রিয় কথা শোনানোর কারণে মানসিকভাবে জহুরা জেসমিন অনেকটাই নাজুক ছিল। লজ্জার ভাব তখনও তার পুরোপুরি কাটেনি। বাজার নিয়ে সালাউদ্দীন তার সামনে এলে জহুরা জেসমিন চোখ তুলে সালাউদ্দীনের দিকে সরাসরি তাকাতে পারলো না। বাজার খরচ অন্তে সেদিন এক টাকা আট আনা বেঁচে গিয়েছিল। হিসাব দেয়ার পরে সালাউদ্দীন সেই এক টাকা আট আনা পয়সা জহুরা জেসমিনের সামনের টেবিলের ওপর রাখলে চোখ না তুলেই জহুরা জেসমিন বললো, থাক থাক, ও কয়টা পয়সা আর ফেরত দিতে হবে না। ওটা তুমি রেখে দাও।

জহুরা জেসমিন সালাউদ্দীনকে 'আপনি' না বলে এই 'তুমি' বলার পেছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। বাজারের টাকা-পয়সা বুঝে দেয়া আর হিসাব বুঝে নেয়ার কালে জহুরা জেসমিন সালাউদ্দীনকে 'আপনা-আপনি' বলেই সম্বোধন করা শুরু করে। কিন্তু বাদ সাধে জামাল মিয়া। সালাউদ্দীনকে আপনা-আপনি করতে দেখে একদিন জামাল মিয়া নাক সিট্‌কিয়ে বলে, এ কি আদিখ্যেতা শুরু কইরাছো আম্মাজান? তুমি কলেজে পড়া মাইয়া আর এইডা একটা স্রেফ কেলাস্‌ এইট্‌ পড়া আদমী। এর ওপর আবার হে নকরী করে তোমাদের বাড়িতে। তোমরা তার মুনিব। তুমি তারে 'আপনি-আপনি' করলে লোকে হুনে বলবে কি? সবাই হাসবো না?

থতমত খেয়ে জহুরা জেসমিন 'চাচা' বলে মুখ তুললে জামাল মিয়া জোর দিয়ে বললো, 'তুমি' বলবে, 'তুমি'। হেরে 'তুমি' কইবা। যেইডা যেহানে মানায়, হেইডা বলাই ভালা।

জহুরা জেসমিন এ কথায় ইতস্তত করতে থাকলে সালাউদ্দীন মিয়াও জোর দিয়ে বলেছিল, জি মেম সাহেব, জি! আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। আপনারা আমাকে 'আপনি-আপনি 'করলে শুনতে আমারও খুবই খারাপ লাগে।

এ নিয়ে সেদিন অনেকক্ষণই কথা কাটাকাটি হয়। কিন্তু সালাউদ্দীনের পীড়াপীড়িতে জহুরা জেসমিন অবশেষে সালাউদ্দীনকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা শুরু করে।

থাক সে কথা। সালাউদ্দীনকে বিনে দোষে তিরস্কার করায় জহুরা জেসমিন সেদিন অনেকটাই অপ্রকৃতিস্থ ছিল আর সে কারণে সে যথেষ্টই আগ্রহী ছিল সালাউদ্দীনের প্রতি সহৃদয় আচরণ করার জন্যে। তাই, বাজার খরচ অন্তে বেঁচে যাওয়া এক টাকা আট আনা পয়সা সালাউদ্দীন টেবিলের ওপর রাখলে জহুরা জেসমিন সহৃদয় কণ্ঠে বললো, থাক থাক, ও কয়টা পয়সা আর ফেরত দিতে হবে না। ওটা তুমি রেখে দাও।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সালাউদ্দীন বললো, জি, রেখে দেবো মানে?

www.boighar.com

জহুরা জেসমিন বললো, মানে, ওটা তুমি নেবে। ওটা আর ফেরত দিতে হবে না।

সালাউদ্দীন বললো, আমি নেবো কি রকম? আমি নিয়ে কি করবো?

মাটির দিকে চেয়ে থেকেই জহুরা জেসমিন স্মিত হাস্যে বললো, কি আবার করবে? ইস্টিশানের দিকে বেড়াতে গেলে চা-বিস্কুট খাবে...!

কথার মাঝেই সালাউদ্দীন বললো, চা-বিস্কুট খাবো তা কেমন? এই পয়সা দিয়ে চা-বিস্কুট খাবো কেন?

খাবে। তাতে দোষ কি?

দোষ তো আছেই মেম সাহেব। এ পয়সা তো আমার পয়সা নয়।

তোমার পয়সা নয় কেন? আমি তো তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি এ পয়সা।

দিয়ে দিচ্ছেন? কেন? আমার মাইনে থেকে পরে কেটে নেবেন, এই হিসাবে?

আরে ছি, ছি! কি যে বলো! এই কয়টা পয়সা তোমার বেতন থেকে কেটে নেবো আমি? তওবা, তওবা! ওটা তোমাকে বকশিশ দিচ্ছি।

এবার সালাউদ্দীনের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলো। বললো, মাফ করবেন মেম সাহেব, আমি কোন বকশিশ নেই না।

চোখ এবার তুলতেই হলো জহুরা জেসমিনকে। সালাউদ্দীনের মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে সে বললো, বকশিশ নেও না মানে?

মানে, আমি কোন বকশিশ বা দান অনুদান নিই না। ওতে নিজেকে বড়ই খাটো করা হয়।

বলো কি! নিজেকে খাটো করা হয়?

জি মেম সাহেব। ওটাকে ভিক্ষাবৃত্তির কাছাকাছি একটা কিছু বলেই মনে করি আমি। ওটা আমার মান-সম্মানে লাগে।

রাগ হলো জহুরার। বললো, বকশিশ বা দান-অনুদান নেয়াকে তুমি ভিক্ষাবৃত্তির কাছাকাছি মনে করো?

জি মেম সাহেব, ওটা মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তির দিকে অনুপ্রাণিত করে।

বটে। সেজন্যেই ওসব তুমি নাও না। এতটাই বড়লোক তুমি?

মেম সাহেব!

তোমার কোন পয়সা-কড়ির দরকার নেই?

জরুর আছে মেম সাহেব। পয়সা-কড়ির দরকার আছে বলেই তো আপনাদের এখানে নকরী করতে এসেছি। মাস অন্তর মাইনে পেলে তবে নতুন জামা-কাপড় কিনবো। দেখুন না, জামাটার আমার দু'তিন জায়গা ছিঁড়ে গেছে। পায়জামারও কাহিল অবস্থা।

তবু বকশিশ দান নেবে না? এই চাকরীটা যদি না পেতে?

তাহলে কায়িক প্ররিশ্রম করে পয়সা উপার্জন করতাম। মোট টানতাম, ইট ভাংতাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই দুখানা হাত দিয়েছেন কি করতে? ভিক্ষে করে খেতে? অন্যের কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাততে? আল্লাহ তায়ালা হাত দিয়েছেন রোজগার করে খাওয়ার জন্যে। ভিক্ষে নেয়ার জন্যে নয়।

সালাউদ্দীনের এই দীপ্ত বক্তব্যের মুখে জহুরা জেসমিন বাক হারিয়ে ফেললো। ক্ষণকালের জন্যে সে কোন কথাই বলতে পারলো না। জহুরা জেসমিনের সামনে এমন জোর গলায় কথা বলার জন্যে সালাউদ্দীনও ক্ষণিকের তরে নীরব হয়ে গেল। মুখে তার তৎক্ষণাৎ কোন বাক্য স্ফূরণ হলো না। পরে সে বিনীত কণ্ঠে বললো, অপরাধ নেবেন না মেম সাহেব! নাখোশ হবেন না আমার কথায়, আপনিই বুঝে দেখুন, স্বাবলম্বী হওয়াটা কি প্রত্যেকের উচিৎ নয়?

জহুরা জেসমিন আর বুঝে দেখবে কি? সালাউদ্দীনের নির্মল চাল-চলনে জহুরা জেসমিন আগে থেকেই অনেকটা প্রীত ছিল। আজ সালাউদ্দীনের রাখা ঐ এক টাকা আট আনা পয়সা আরো আশ্চর্যান্বিত করলো তাকে।

'ধন্যবাদ মেম সাহেব'! বলে হাত তুলে ছোট্ট একটা সালাম দিয়ে ঈষৎ হেসে সেখান থেকে চলে গেল সালাউদ্দীন আহমদ।

জহুরা জেসমিনের ভাই আফাজ ও হাফিজ নামের ছেলে দুটি অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল ও বেয়াড়া গোছের। শক্ত শাসন ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এই ছেলে দুটির আদব-কায়দা আর লেখাপড়া এখনও ঠিক মতো হয়নি। খুবই তারা চঞ্চল আর অস্থির এবং তাদের মন-মগজ দুষ্টুমীতে ভরা। লেখাপড়ায় এদের মন নেই আদৌ। অবশ্য মেধার দিক দিয়ে খুব একটা খারাপ এরা নয়। এরা অনেকটাই মেধাবী। কিন্তু দুষ্টু স্বভাবটাই এদের মেধা-বুদ্ধি সব আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সালাউদ্দীন এ বাড়িতে নকরীতে বহাল হওয়ার সময় এই ছেলে দুটি বাড়িতে ছিল না। বেশ কিছুদিন পরে তারা বাড়িতে ফিরে এলেও এই নয়া শিক্ষকের আশেপাশেই তারা ভিড়লো না, দূরে দূরে থেকে আরো ক'টা দিন কাটিয়ে দিলো। এর পরে তাদের যখন পড়াতে বসলো সালাউদ্দীন, তখন সে দেখলো, কাজটা খুবই দুরূহ। প্রথম দিন তো তাদের দশটা মিনিটও পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখতে পারলো না। একটু অন্যমনস্ক হতেই চোখের পলকে ছেলে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল! কোথায় গেল তার কোন হদিসই পেলো না সালাউদ্দীন। দ্বিতীয় দিন তাদের ডেকে এনে পড়ার টেবিলে বসালেও ক্ষণকাল পরেই তারা দৌড় দিয়ে উঠে গেল পড়ার টেবিল থেকে এবং দরোজার কাছে এসে দুই হাতের আঙ্গুল দুই কানের কাছে নিয়ে এবং জিহ্বা বের করে আঙ্গুল ও জিহবা এক সাথে নেড়ে সালাউদ্দীনের প্রতি ভেংচি কাটতে কাটতে দৌড়ের ওপর পালিয়ে গেল। শিক্ষককে ভেংচি কেটে পালিয়ে আসার আনন্দে হাসিতে তারা লুটোপুটি খেতে লাগলো।

তার পরের দিন জহুরা জেসমিন শক্ত একখানা বেত এনে সালাউদ্দীনের হাতে দিয়ে বললো, কি ব্যাপার, দুদিন ধরে ছেলে দুটো

বইঘর.কম ও রোকন

তোমাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কেটে পড়লো আর তুমি চুপচাপ বসে বসে তাই দেখলে? একটা ধমক দিতেও পারলে না?

সালাউদ্দীন বললো, না, মানে ওদের মানসিকতাটা কি অর্থাৎ ওরা কি কারণে পড়াশোনাকে ভয় পায়, আমি সেইটেই স্টাডি করার চেষ্টা করছি।

জহুরা জেসমিন বললো, স্টাডি করার চেষ্টা করছো? আজীবন চেষ্টা করলেও ওদের মানসিকতা স্টাডি করা শেষ হবে না তোমার। আগের শিক্ষকেরা তবু দু'এক ঘণ্টা ওদের পড়ার টেবিলে আটকে রাখতে পেরেছিলেন। ওরা ভয় করতো ঐ শিক্ষকদের। কিন্তু তোমাকে তো দেখছি ওরা গ্রাহ্যই করে না। গ্রাহ্য না করলে ওদের তুমি পড়াবে কি করে?

সালাউদ্দীন আম্‌তা আম্‌তা করে বললো, হ্যা, তা তো ঠিকই।

সেজন্যেই তো প্রথম দিন বলেছিলাম, আমার ছোট দুটি ভাই আছে। তারা খুবই অস্থির ও চঞ্চল। ওদের কি পড়াতে পারবে? তুমি তো সেদিন নির্দ্বিধায় বলেছিলে, 'হ্যাঁ, পারবো।' এই কি তোমার পারার নমুনা?

জবাবে সালাউদ্দীন টেনে টেনে বললো, তা কথা হলো, পারবো ঠিকই, তবে কয়েকটা দিন সময় লাগবে।

জহুরা জেসমিন ঝাঁঝের সাথে বললো, এই রকম ভেজা বেড়াল হয়ে থাকলে কয়েকটা বছর সময় নিলেও তুমি তা পারবে না।

জি?

মার দেয়া শুরু করো। এই যে বেত রইলো, মার দিতে তেমন একটা না পারলেও মার দেয়ার ভাব করো, শাসন গর্জন করো। তবেই ওরা গ্রাহ্য করবে তোমাকে আর ওদের মন বসবে লেখাপড়ায়।

তা কি ঠিক হবে? মেরে পিটে পড়ালে...!

জরুর ঠিক হবে। কোন ছেলে যদি সহজ মনে লেখাপড়ায় আগ্রহী না হয়, তাকে মেরে-পিটেই পড়াতে হয়। কথায় বলে, 'টু স্পেয়ার দি রড্, স্পয়েল দি চাইল্ড্।' বেত রেখে দেবে তো ছেলে বখে যাবে। বখাটে হয়ে যাবে। 'ছেলেকে থাবা, বুড়োকে বাবা' শাস্ত্রীয় বচন বুঝলে। এগুলো মিথ্যা হয় না।

তা মানে...!

তবু মানে মানে করবে না। এই বেত রাখো। আমি আমার ভাই আফাজ আর হাফিজকে এই পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরের দিক দিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিচ্ছি। দেখি ওরা পালায় কি করে!

বইঘর.কম ও রোকন

মেম সাহেব!

বাইরে দরোজার পাশে কদম আলী বসে থাকবে। বেত মেরে মেরে ওদের কাছ থেকে পড়া আদায় করে নাও। যে পড়া দেবে সেই পড়া তৈরি করে ওরা ঠিক ঠিক তোমাকে দিতে পারলে তবেই ওদের ছুটি দেবে, তার আগে নয়। কদম আলীকে ডাক দিলে সে দরোজা খুলে দেবে।

কথা মতোই কাজ হলো। জহুরা জেসমিন তার ভাই দুটোকে ধরে এনে পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে দিলো এবং বাইরের দিক দিয়ে দরোজা বন্ধ করে কদম আলীকে দরোজার পাশে বসিয়ে দিলো।

জহুরা জেসমিনের ভাই আফাজ ও হাফিজ জহুরা জেসমিনকে অনেকটাই ভয় করতো। জহুরা জেসমিন তাদের এনে পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে দেয়ার পর বাইরের দিক দিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিলে আর স্যারের অর্থাৎ সালাউদ্দীনের হাতে মোটা বেত দেখে দুই ভাই-ই আপাতত ঘাবড়ে গেল এবং খামোশ হয়ে এসে পড়ার টেবিলে বসলো। সালাউদ্দীন তাদের দুজনের ইংরেজি বই দুটি খুলে ছোট ছোট দুটি প্যারা দুজনকে অর্থসহ পড়িয়ে শোনালো এবং দুজনকে সেই প্যারা দুটি পড়তে বললো। বললো, 'প্রতিটি শব্দের বানান আর অর্থ এখনই রপ্ত করা চাই। যে শব্দের অর্থ ভুলে যাবে আমাকে জিজ্ঞেস করে সেটা ঠিক করে নেবে। পড়া যখন ধরবো, বানান আর অর্থ ঠিক মতো বলতে পারলে তবেই তোমাদের ছুটি, নইলে আজ আর তোমাদের ছুটি নেই।

হাতের বেতটা এক পাশে রেখে দিলো সালাউদ্দীন।

আফাজ ও হাফিজ অত:পর সুবোধ ছেলের মতো নত মস্তকে তাদের পড়া পড়তে শুরু করলো। কিন্তু দশটা মিনিটও গেল না। এরই মধ্যে দূর হলো তাদের সুবুদ্ধি আর দুর্বুদ্ধি এসে ভর করলো তাদের মাথায়। দুজনই তাদের বই দুটো নিয়ে অন্য দিকে মুখ করে ঘুরে বসলো আর পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই চাপা কণ্ঠে ব্যাঙ ও কুকুরের ডাক ডাকতে লাগলো।

সালাউদ্দীন তা লক্ষ করলো তখনই। কিন্তু লক্ষ করেও সে কিছুই বললো না। স্যার কিছুই বলছে না দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেল। তাই আফাজ ও হাফিজের মুখে যথাক্রমে ব্যাঙ ও কুকুরের ডাক ক্রমশ উচ্চ হয়ে উঠতে লাগলো। আফাজ এক সময় কিছুটা বেখেয়ালেই তার ব্যাঙের ডাকটা খুবই শব্দ করে ডেকে উঠে হো হো করে হেসে উঠলো সালাউদ্দীন।

চমকে গেল আফাজ ও হাফিজ! ক্রোধের পরিবর্তে সালাউদ্দীনকে সশব্দে হাসতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তারা স্যারের মুখের দিকে তাকালো। হাফিজকে লক্ষ করে সালাউদ্দীন হাসতে হাসতে বললো, হলো না, হলো না।

হতবুদ্ধি হয়ে আফাজ ভয়ে ভয়ে বললো , কি হলো না, স্যার?

সালাউদ্দীন হাসি মুখে বললো, তোমার ব্যাঙের ডাকটা ঠিক মতো হচ্ছে না। ওভাবে ব্যাঙ ডাকে না।

আফাজ ফের ভয়ে ভয়ে বললো, জি?

সালাউদ্দীন বললো, আমাদের বাড়ির সামনে একটা ডোবা আছে। গ্রীষ্মকালে হঠাৎ যখন বড় ঢল নামে ঐ ডোবা ভরে যায় তখন অনেক কোলা ব্যাঙ কোত্থেকে এসে ঐ ডোবায় উথাল-পাথাল সাঁতার কাটে আর সবাই মিলে বিপুল শব্দে ডাকতে থাকে। এন্তার ডাকে।

রাগের বদলে স্যারের শান্তশিষ্ট ভাব আর মুখে হাসি দেখে আফাজের মনের ভয়টা দূর হয়ে গেল। সে এবার উৎসাহ ভরে প্রশ্ন করলো, আপনি সেটা দেখেছেন স্যার?

সালাউদ্দীন বললো, দেখেছিই তো। দেখেছি বলেই তো বলছি।

স্যার!

তোমাদের বাড়ির সামনেও তো একটা মস্ত বড় ডোবা আছে। গরমের পর হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে ঐ ডোবাটা ভরে গেলে দেখবে কত কোলা ব্যাঙ সেখানে সাঁতার কাটছে আর এক সাথে সবাই তারস্বরে ডাকছে! তখন খেয়াল করলেই দেখতে পাবে ব্যাঙ কিভাবে ডাকে। তোমার মতো ঐভাবে ডাকে না।

www.boighar.com

ইতিমধ্যে হাফিজের মনেও সাহস এসে গিয়েছিল ! সে ফস করে প্রশ্ন করলো, ব্যাঙ কিভাবে ডাকে, আপনি তা জানেন স্যার?

সালাউদ্দীন বললো, জানিই তো! না জানলে কি এমনিই বলছি?

ছেলে দুটি এবার খুবই উৎসাহভরে দ্রুত স্যারের দিকে সরে এসে বসলো। বিপুল আগ্রহে আফাজ প্রশ্ন করলো, তাহলে সেটা কি একটু শোনাবেন স্যার? সামান্য একটু?

সালাউদ্দীনও উৎসাহী কণ্ঠে বললো, শুনতে চাইলেই শোনাবো।

আর ছেলে দুটিকে পায় কে? তারা দুজনই স্যারের দিকে ঝুঁকে পড়ে আকুল কণ্ঠে বললো, তাহলে শোনান স্যার, একটু শোনান স্যার, দোহাই স্যার...!

বইঘর.কম ও রোকন

সালাউদ্দীন এবার ব্যাঙের মতো সুর করে গলার গভীর থেকে বললো, ঘ্যাঁ-ঘুঁ-ঘ্যাঁ-ঘুঁ-ঘ্যাঁ-ঘুঁ...!

কয়েকবার 'ঘ্যা-ঘুঁ' করার পর সালাউদ্দীন হেসে উঠে বললো, এভাবে বুঝলে, এভাবে ডাকে। তোমার মতো স্রেফ 'ঘ্যাং' করে না

আফাজ সোল্লাসে বললো, হ্যাঁ স্যার, ঠিকই তো, ব্যাঙ তো এভাবেই ডাকে। আমারটা ঠিক ঠিক হয়নি।

আফাজ থামতেই হাফিজ প্রশ্ন করলো, আমারটা ঠিক হয়েছে স্যার? আমার কুকুরের ডাকটা।

সালাউদ্দীন এবারও হাসি মুখে বললো, না না, তোমারটাও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। কুকুরও ঠিক ঐভাবে ডাকে না।

হাফিজ প্রশ্ন করলো, তাহলে কিভাবে ডাকে স্যার?

সালাউদ্দীন বললো, কুকুরেরা সাধারণত অচেনা মানুষ দেখলে বা দূরে কোথাও অন্য কোন কুকুর ডাকছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ওঠে। তখন তারা ঘন ঘন কয়েকবার 'হাউ হাউ' শব্দ করে পরে লম্বা করে ডাকে, হাউ-উ-উ-উ...!

এবার ছাত্র শিক্ষক তিনজনেই এক সাথে হেসে উঠলো। হাফিজ বললো, আপনি শেয়ালের ডাক জানেন স্যার? শেয়ালের ডাক ডাকতে পারেন?

সালাউদ্দীন বললো, হুঁ, খুব পারি।

শেয়ালের ডাক, ছাগলের ডাক, সব ডাকতে পারি।

হাফিজ বললো, তাহলে শেয়ালের ডাকটা একটু শোনান না স্যার?

সালাউদ্দীন বললো, উঁহু, তা হবে কি করে? তোমরা যা বলবে তাই আমি করবো আর আমি যা বলবো তা তোমরা করবে না, এমন হলে হবে কি করে? আমার কথা ঠিক ঠিক শুনলে তোমাদের কথাও আমি ঠিক ঠিক শুনবো।

আফাজ সাগ্রহে প্রশ্ন করলো, কি আপনার কথা স্যার? আপনার কথা বলুন, আমরা ঠিক ঠিক তা শুনবো।

সালাউদ্দীন বললো, ঐ যে তোমাদের পড়া দেখিয়ে দিলাম, বানান আর অর্থসহ ঐ পড়া ঠিক মতো দিতে পারলে আগামীকাল তোমাদের আমি শেয়ালের ডাক, ছাগলের ডাক সব শোনাবো।

এর রকম আগ্রহভরে আফাজ ফের প্রশ্ন করলো, সত্যিই শোনাবেন স্যার?

সালাউদ্দীন বললো, একশ'বার শোনাবো।

আজকের পড়াটা তৈরি করে দাও কালকে ওসব ডাক অবশ্যই শোনাবো।

আফাজ এবার ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে স্যার, একটু সময় দিন, এখনই আমরা আমাদের পড়া তৈরি করে দিচ্ছি। বলেই সে হাফিজকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই হাফিজ, পড়, শিগ্গির তৈরি করো পড়া।

অত:পর দুভাই গভীরভাবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলো এবং তারা যে মেধাবী মিনিট বিশেকের মধ্যেই তারা সেটা প্রমাণ করে ছাড়লো। মিনিট বিশেক এক মনে পড়ার পরে তাদের অনুরোধে সালাউদ্দীন তাদের পড়া ধরলে সালাউদ্দীনকে অবাক করে তারা হুড়হুড় করে প্যারা দুটি পড়ে দিলো এবং প্রতিটি শব্দের বানান ও অর্থ নির্ভুলভাবে বলে দিলো। ভুল কিছুই হলো না। www.boighar.com

পড়া তৈরি করার সময় মাত্র কয়েকবার স্যারকে জিজ্ঞেস করে কয়েকটা শব্দের অর্থই তারা খেয়াল করে নিয়েছিল, এর বেশি আর কোন কস্‌রতই করতে হয়নি তাদের।

শেয়ালের ডাক শোনার আশায় পরের দিনও ঐ একইভাবে ছেলে দুটি তাদের পড়া নির্ভুলভাবে তৈরি করে দিলো আর বিনিময়ে সালাউদ্দীনও হাসি-খুশি পরিবেশ তৈরি করে কিছুক্ষণ তাদের শেয়াল ও ছাগলের ডাক শুনিয়ে দিলো।

অত:পর জমে উঠলো ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। সালাউদ্দীন মাঝে মাঝে তাদের ছোট ছোট আর মজার মজার গল্প শোনায় আর ছেলে দুটিও তাদের দৈনন্দিন পড়া ঠিক ঠিক তৈরি করে দেয়। এর পর আর কোন জীব-জানোয়ারের ডাক ডাকতে হয় না বা গল্প শোনানোরও বেশি প্রয়োজন পড়ে না।

স্যারের মধুর সান্নিধ্য পাওয়ার আশাতেই দুভাই যথাসময়ে পড়ার ঘরে ছুটে আসে। কোন কোন দিন কিছুটা আগেই ছুটে আসে।

এরই মাঝে হাফিজ একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করলো, স্যার, আপনি গান জানেন? 'ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' এই গান?

বইঘর.কম ও রোকন

মুখ তুলে সালাউদ্দীন প্রশ্ন করলো, কেন, হঠাৎ এই গানের কথা বলছো কেন?

হাফিজ বললো, এই যে স্যার আমার বইতে বকের ছবি আছে, বকটা পুঁটি মাছ ধরে খাচ্ছে। এই পুঁটি মাছ খেতে গিয়েই তো বক ফাঁদে পড়ে, তাই না স্যার,?

সালাউদ্দীন বললো, হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

হাফিজ বললো, স্যার, কদম আলী মাঠ থেকে আসতে আসতে ঐ গানটা গায়। বড়ই সুন্দর গান। আপনি কি গানটা জানেন স্যার?

সালাউদ্দীন বাধা দিয়ে বললো, দূর পাগল, পড়ার ঘরে গান গাওয়া যায়? এসব গান গাইতে হলে মাঠে বা নদীর ধারে যেতে হয়। বিকেলে আমার সাথে নদীর ধারে বেড়াতে যেও, শুনিয়ে দেবো।

হাফিজ বললো, জি স্যার, জি স্যার! তাহলে রোজ আপনার সাথে বেড়াতে যাবো।

শুনে আফাজ বললো, আমিও যাবো স্যার, আমিও যাবো। সব সময় এক জায়গায় ঘুরপাক খেতে ভালো লাগে না। শুধু বাড়ি আর এই পাড়াটা? এর বাইরে যাওয়াই হয় না!

সালাউদ্দীন বললো, বেশ তো যাবে। বেড়ানোর সময় ফাঁকা আর খোলা জায়গায় বেড়ানোই তো ভালো।

এভাবে দিনে দিনে গৃহশিক্ষকের সাথে এদের এতই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠলো যে, স্যারের প্রশংসা ছাড়া এদের মুখে আর কোন কথাই বেশি শোনা যায় না। সেই সাথে, স্যারের সঙ্গ ছাড়া আর কারো সঙ্গই অধিক ভালো লাগে না তাদের। পাশাপাশি পড়াশোনাতেও তারা এতটাই মনোযোগী হলো যে, স্যার আর বই এবং বই আর পড়াকেই তারা তাদের দিবারাত্রির সাধনা বানিয়ে নিলো।

এতে ফলাফল যা হবার তাই হলো। স্কুলের পরীক্ষায় যারা পাস করতেই পারতো না, হাফ ইয়ারলী পরীক্ষায় তারা প্রথম স্থান দখল করলো। এটা দেখে স্কুলের শিক্ষকেরা সবাই অবাক! সবার মুখে এক কথা, এ কি বিস্ময়! এ কি বিস্ময়!

অবাক হলো, ছেলে দুটির অভিভাবকেরাও। ফল বেরুনোর পর জহুরা জেসমিন দুই চোখ কপালে তুলে সালাউদ্দীনকে প্রশ্ন করলো, কী তাজ্জব।

বইঘর.কম ও রোকন

লেখাপড়ায় ওদের এতটা উন্নতি কি করে হলো? এমন একটা অসম্ভবকে তুমি সম্ভব করলে কি করে?

জবাবে সালাউদ্দীন হাসি মুখে বললো, মেম সাহেব, ম্যাজিক! স্রেফ ম্যাজিক!

৩

ঢাকাইয়া জামাল মিয়ার অল্প বিদ্যাটা আজ আবার ভয়ংকর হয়ে উঠলো। এই রকম ভয়ংকর হয়ে ওঠার কারণেই সে মীর সাহেবের মামার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তার এই ভয়ংকর বিদ্যাটা জাহির করতে গিয়ে জামাল মিয়া মীর সাহেবের মামা আর মামাতো ভাইদের জান ঝালাপালা করে তুলেছিল আর ফলে সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে অবধি জামাল মিয়া এখন চেপে আছে মীর সাহেবের ঘাড়ের ওপর আর 'তেড়ে-কিটি-তাক' মেরে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। তা দিক। তাতে কারো অসুবিধে নেই। কিন্তু সময় সময় সে কারো কারো অসুবিধা সৃষ্টি করছে তার বিদ্যা জাহির করতে গিয়ে অর্থাৎ, এখানে এসেও সে তার ঐ ভয়ংকর বিদ্যাটা জাহিরের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। সুযোগ পেলেই সে সেটা জাহির করতে বসে। নিরীহ ও গোবেচারা লোকদের ওপর বিদ্যা জাহির করার তার আগ্রহটা বেশি। মীর সাহেব বা তাঁর স্ত্রী-কন্যার ওপর বিদ্যা জাহির করার সাহস তার নেই। তাই সে ঝুঁকে পড়লো কদম আলী আর বাড়ির চাকর-বাকরদের ওপর।

জীবনে যারা এক বারও পাঠশালায় যায়নি তাদের ওপর কিছুদিন সে ধুমছে তার কষ্টার্জিত বিদ্যাটা জাহির করে বেড়ালো। অবশেষে বুঝতে পারলো, 'ক বর্গ' বঞ্চিত হওয়ায় এদের ওপর বিদ্যা জাহির করে আনন্দ সে ঠিক মতো পাচ্ছে না। এটা বুঝতে পেরে সে খুঁজতে লাগলো বিদ্যা জানা লোক এবং শেষ পর্যন্ত এসে সে সওয়ার হলো সালাউদ্দীন আহমদের ওপর।

বিকেলে পড়ার পরে ছাত্রেরা অর্থাৎ আফাজ ও হাফিজ পড়ার ঘর থেকে বের হয়ে গেলে শিক্ষক সালাউদ্দীনও বাইরে এসে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময় তার ওপর চড়াও হলো জামাল মিয়া। কয়েক দিন ধরেই সে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সালাউদ্দীনের কাছে তার ভয়ংকর বিদ্যাটা জাহির করার জন্যে। কিন্তু সালাউদ্দীনের ও তার নিজের কর্ম ব্যস্ততার কারণে সে সুযোগ সে পায়নি। আজ সেই সুযোগটা পেয়েই জামাল মিয়া তড়িৎ বেগে এসে সালাউদ্দীনের মুখোমুখি দাঁড়ালো এবং সরাসরি প্রশ্ন করলো, কি মাস্টার, ছাত্রদের বিদ্যা শিক্ষা দেওন হলো বুঝি? www.boighar.com

উল্লেখ্য একজন কৃতী ও সদাচারী গৃহশিক্ষককে সব সময় নাম ধরে ডাকাটা দৃষ্টিকটু হওয়ায় ইতিমধ্যে এ বাড়ির সকলেই তাকে 'মাস্টার সাহেব' বলে ডাকতে শুরু করেছেন। বাড়ির প্রধান মীর সাহেব থেকে শুরু করে বাড়ির চাকর কদম আলী পর্যন্ত সবার কাছেই সালাউদ্দীন এখন 'মাস্টার' বা 'মাস্টার সাহেব'। এই সম্বোধন করতেই বাড়ির ছোট বড় সবাই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

জামাল মিয়ার প্রশ্নে সালাউদ্দীন কিছুটা বিস্মিত হলো। বললো, জি চাচা, ওদেরকেই তো দৈনিক পড়াই আমি। হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন?

জামাল মিয়া ভারিক্কী চালে বললো, পড়াও হেডা তো জানি। কিন্তুক নিজে তুমি লেখাপড়াডা ভালোমতো জানো তো?

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে সালাউদ্দীন বললো, তার অর্থ?

জামাল মিয়া বললো, অর্থডা অইলো গিয়া আমার মতো বিস্তর বিদ্যা পেটে না থাকলে অল্প বিদ্যা লইয়া ছেলে পড়ানো যায় না।

এবার হাসি পেলো সালাউদ্দীনের। সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তাই নাকি চাচা? আপনার পেটে তাহলে বিস্তর বিদ্যা বিদ্যমান?

জামাল মিয়া সদম্ভে বললো, বিস্তর, বিস্তর! তিন চারডে বছর ধইরা পাঠশালায় গিয়া অন্যের মতো আমি হুদুই ঘাস কাটি নাই বইয়া বইয়া, বিস্তর বিদ্যাই পেটে-মগজে পুইরা লইছি।

আচ্ছা!

আচ্ছা নয়, আচ্ছা নয়! আজ তোমারে হেইডা টের পাওয়াইয়া দিমু।

চাচা!

তোমার বিদ্যাডা অন্যে পরীক্ষা করলেও আমি হেইডা এহনও পরীক্ষা কইরা দেহি নাই। অহন তা দেইখাই তবে ছাড়ুম।

পরীক্ষা করবেন আপনি?

আলবত! কও দেহি, 'গাম্ভৌল' মানে কি?

কৌতুক চেপে সালাউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'গাম্ভৌল'! সেটা আবার কি কথা?

কি কথা নয়। গাম্ভৌল মানেডা কি, হেইডা আমি চাই।

না চাচা, ওর মানেটা তো জানিনে।

জামাল মিয়া সদর্পে বললো, জানবা না, জানবা না। তোমার মতো অতি ছামান্য বিদ্যা যাদের পেটে, তারা কেউই হেডার মানে জানে না। গাম্ভৌল মানে গাম্বৌল, বুঝলা?

গামৌল! না চাচা, তবু তো মানেটা পরিষ্কার হলো না!

হলো না, গুটুল, গুটুল। তোমরা যেটারে বাটুল কও, হেইডা।

বাটুল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বাটুল। ঐ গোল গোল ফুল। ঐ হালার ফল কেউই খায় না আর ঐ গাছের কাঠ দিয়া খড়ি ছাড়া কিছুই হয় না। হালায় বিলকুল অবস্তু।

চাচা!

এবার কও দেহি কাংকৌড় মানে কি?

কাংকৌড়? না চাচা, এর মানেও তো জানিনে।

জানো না? কাঁকড়া, কাংকৌড় মানে কাঁকড়া!

একের পর এক এমনই সব ব্যাকরণ ও অভিধান বহির্ভূত শব্দের মানে ধরতে লাগলো জামাল মিয়া।

জবাবে সালাউদ্দীন কেবলই বলতে লাগলো, না চাচা, জানিনে।

এতে করে লাফিয়ে উঠলো জামাল মিয়া। সশব্দে বললো, তওবা, তওবা! এই বিদ্যা লইয়া তুমি এ বাড়ির পোলাপাইনরে পড়াইবার লাগছো? হ্যাশ্-হ্যাশ্, পোলাপাইনগুলার ইহকাল পরকাল—হগ্গল্ডাই হ্যাশ্!

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো জহুরা জেসমিন। জামাল মিয়াকে লক্ষ করে বললো, এই যে চাচা, তুমি এখানে? আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আর তুমি এখানে? এখানে এসে এভাবে চীৎকার করছো কেন?

জামাল মিয়া একই রকম উচ্চ কণ্ঠে বললো, অইবো না, অইবো না! ঐ নামাজ-কালামটুকু ছাড়া, হেরে দিয়া আর কিছুই অইবো না। এরে দিয়া

বইঘর.কম ও রোকন

পোলাগুলারে পড়াইলে হেগোর জীবনটাই মাটি অইয়া যাইবো, লেখাপড়া কিছুই অইবো না। বিদায় কইরা দাও, এরে অহনই বিদায় কইরা দাও।

জহুরা জেসমিন বিস্মিত কণ্ঠে বললো!, বিদায় করে দেবো? কারে?

জামাল মিয়া বললো, এই মাস্টারে লেখাপড়া কিছুই জানে না। আমি পরীক্ষা কইরা দেখলাম, পেটে এক ফোঁটা বিদ্যা নাই। এ পোলাপাইনদের পড়াইবো কেমনে?

জামাল মিয়ার পাগলামী বুঝতে পেরে জহুরা জেসমিন শক্ত কণ্ঠে বললো, সেটা পরে দেখবো। কিন্তু তার আগে তো তোমাকেই এ বাড়ি থেকে বিদায় করা দরকার। খামাকা আর তোমাকে রেখে লাভটা কি?

বুঝতে না পেরে জামাল মিয়া বললো, জি?

একই কণ্ঠে জহুরা জেসমিন বললো, যেখান থেকে এসেছো, তোমাকে তো দেখছি সেখানেই এখন পাঠিয়ে দেয়া উচিত।

পাগলামী ছুটে গেল জামাল মিয়ার। সে চমকে উঠে বললো, ঐ হানে পাঠাইবা মানে? আমার কসুরডা অইলো কি?

কসুর তো তোমার গণ্ডা গণ্ডা। আজ তোমাকে কি বলেছি, তা মনে আছে?

জামাল মিয়া আমতা আমতা করে বললো, তা মানে...!

ঐ তো। কোন কথাই মনে থাকে না তোমার। আজ যে আমি ট্রেনযোগে অনেক দূরে বেড়াতে যাবো, তুমি আর কদম আলী আমার সাথে যাবে—সেটা বিলকুল ভুলেই গেছো? আজ কয়দিন ধরেই তো একথা তোমাকে আমি বলছি।

হুঁশে এসে জামাল মিয়া বললো, ও, তোমার ঐ কোন এক আত্মীয়ার মেয়ের ছাদীতে যাইবা তো? মানে হেই ছাদীর তামাম গয়নাপত্তর তোমরা দেবা আর তুমি হেইডা পৌঁছে দিতে যাইবা, হেই কথা তো? হে কথা তো মনেই আছে আমার।

মনেই আছে? আজকের সন্ধ্যার ট্রেনটাই ধরতে হবে, সে কথা মনে আছে?

জি আম্মাজান, বিলকুল মনে আছে।

আছে? তাহলে এখনো তৈরি হওনি কেন? কদম আলীকে তৈরি হতে বলোনি কেন?

কদম আলীরে? কইচি আম্মাজান, আজ দুপুরেই ওরে কইচি।

দুপুরে বললেই হবে কেন? এখন আবার গিয়ে তাকে বলো। আর তোমরা দুজনই আমার সাথে যাওয়ার জন্যে জলদি জলদি তৈরি হও। সারা রাতের জার্নি! আমি তো আর একা যেতে পারিনে! এর ওপর সাথে ঐ অত টাকার গয়না!

তা বটে, তা বটে! তা গয়নাগুলো হগ্‌গলডাই তো দিয়া গেছে ঐ বেডা সোনার?

হ্যাঁ, দিয়ে গেছে। সামান্য একখান বাকি আছে, সাঁঝের আগেই সেটা দিয়ে যাবে। ও নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যা বললাম, তাই করো।

জি?

যাও, তুমি আর কদম আলী জলদি জলদি তৈরি হও গিয়ে। সাঁঝ হতে তো আর বেশি দেরী নেই!

জি আচ্ছা, জি আচ্ছা!

জামাল মিয়া দ্রুত পদে চলে গেল। এবার সালাউদ্দীনকে লক্ষ করে জহুরা জেসমিন বললো, তুমিও একটু তৈরি হও মাস্টার। টিকিট করে আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে তোমাকেও আমাদের সাথে ইস্টিশানে যেতে হবে। অসুবিধে হবে কি কিছু?

www.boighar.com

সালাউদ্দীন হাসি মুখে বললো, না না, অসুবিধে কি? আমি যাবো আপনাদের সাথে।

জহুরা জেসমিন ফের বললো, আব্বাজানের তো চলাফেরার তেমন শক্তি নেই, জামাল চাচাকে দিয়েই গয়নাগুলো পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সে আবার যে রকম বেহুঁশ। তার হাতে পাঠালে গাড়ির মধ্যেই নির্ঘাত খোয়া যাবে গয়নার এই বাক্সটা। প্রায় বিশ হাজার টাকার অলংকার! তাই বাধ্য হয়ে তাদের সাথে নিয়ে আমাকেই যেতে হচ্ছে।

ও, আচ্ছা।

তুমি একটু সাথে গিয়ে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।

সালাউদ্দীন ফের জোর দিয়ে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা! আমি যথাসময়েই আপনাদের সাথে যাবো।

সেদিন জহুরা জেসমিন ও সালাউদ্দীন যথাসময়েই স্টেশানে এসে হাজির হলো। কিন্তু জামাল মিয়া ও কদম আলী তাদের সাথে ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সালাউদ্দীন প্রশ্ন করলো, কৈ, জামাল মিয়া

আর কদম আলী তো এখনও এলো না? ওরা গেল কোথায়? ট্রেনের ঘণ্টা তো হয়ে গেছে।

জহুরা জেসমিন বললো, আসবে, আসবে! হাতের আংটিটা সোনার এখনও দিয়ে গেল না দেখেই ওদের আমি ঐ আংটি আনতে পাঠিয়েছি। এখনই ওরা এসে পড়বে।

ঠিক সময়ে এলেই হয়।

আসবে, আসবে। ট্রেনের সময় তো ওরাও জানে। তুমি এক কাজ করো আমার এই পোঁটলাটা ধরো। এটা বগলে ফেলে টিকিটগুলো কেটে আনো। আমি ওয়েটিং রুমে যাই। একটু বাথরুমে যাবো।

জহুরা জেসমিনের হাতে গহনার একটা ছোট্ট বাক্স আর বেডশিট দিয়ে জড়ানো একটা পোঁটলা ছিল। পোঁটলাটা সে সালাউদ্দীনের দিকে বাড়িয়ে ধরলে সালাউদ্দীন প্রশ্ন করলো, এটা কি? চাদর দিয়ে জড়ানো এই এটা?

জহুরা জেসমিন বললো, এটা একটা লাইট বেডিং। একটা পাতলা সতরঞ্চি আর ছোট্ট একটা বালিশ এই বেডশিট দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছি। লং জার্নি কিনা! ঘুম ধরবে নিশ্চয়ই। ঘুম ধরলে এই বেডিং বিছিয়ে বাক্সের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়বো। ধরো এটা...!

সালাউদ্দীনের হাতে বেডিংটা দিয়ে জহুরা জেসমিন ওয়েটিং রুমের দিকে রওনা হলো। সালাউদ্দীন হাঁটা দিলো টিকিট কাউন্টারের দিকে।

সালাউদ্দীন লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে সারতেই হুশ্ হুশ্ করে চলে এলো ট্রেন। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে জহুরা জেসমিন দৌড়ে এসে উঠে পড়লো নিকটের এক ইন্টার ক্লাসে। কামরাটা খুবই ছোট। নীচে চার পাঁচজনের বসার মতো একটা আসন আর আসনটির ওপরে একটা সমপরিমাণ বাংকার। ব্যস্, আর কিছুই নেই! জহুরা জেসমিন ছাড়া তখন কামরাটিতে অন্য কোন লোকও ছিল না। জহুরা জেসমিন এসে ট্রেনে উঠতেই টিকিট কেটে নিয়ে তার কাছে ছুটে এলো সালাউদ্দীন। প্রশ্ন করলো, কই, জামাল চাচা আর কদম আলী কি এসেছে?

জহুরা জেসমিন চিন্তিত কণ্ঠে বললো, নাতো, তারা তো এখনো এলো না দেখছি!

সে কি! আসেনি?

না। তুমি একটু এদিক ওদিক চেয়ে দেখো তো, ওদের দেখা যায় কিনা।

সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর ফিরে এসে বললো, না দেখা তো যাচ্ছে না।

জহুরা জেসমিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, যাচ্ছে না?

তাহলে?

ইতিমধ্যেই ট্রেনটি ফের চলতে শুরু করলো। দরোজার হ্যান্ডেল ধরে ট্রেনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে সালাউদ্দীন বললো, চিন্তা করবেন না। তারা হয়তো অন্য কামরায় এসে উঠেছে। লোকের যে ভিড় আপনাকে ওরা হয়তো দেখতে পায়নি।

আরো অধিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জহুরা জেসমিন বললো, দেখতে পায়নি?

না পাওয়াই স্বাভাবিক। আসতে দেরী করেছে নিশ্চয়ই। পরের স্টেশানে গেলেই ওরা খুঁজে নেবে আপনাকে।

খুঁজে নেবে? যদি না নেয়? মানে আদৌ যদি না এসে থাকে ওরা?

ট্রেনের গতি তখন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। হ্যান্ডেল ধরে দৌড়েও আর কুলোতে পারছে না সালাউদ্দীন। এই অবস্থায় জহুরা জেসমিন বললো, না না, আমি আর যাবো না। এখানেই নামবো...!

বলেই জহুরা জেসমিন ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নামার উদ্যোগ নিলো। পরনের শাড়ী গুটিয়ে নিতেই সালাউদ্দীন চমকে উঠে বললো, ওর বাপরে

সর্বনাশ! নামবেন না, নামবেন না। আর নামার উপায় নেই। এ অবস্থায় নামতে গেলে নির্ঘাত ট্রেনের তলে পড়ে যাবেন আর ট্রেনে কেটে মারা যাবেন।

জহুরা জেসমিন আর্ত কণ্ঠে বললো, সেকি! আমি এভাবে যাবো কি করে? আমার বেডিং, টিকেট...!

খেয়াল হতেই সালাউদ্দীন বললো , ওহো, ওগুলো তো আমার কাছে!

বলেই হ্যান্ডেল ধরে সালাউদ্দীন সর্বশক্তি নিয়োগ করে লাফিয়ে উঠলো কামরায়। ট্রেন তখন পূর্ণ গতিতে ছুটছে।

কামরার মধ্যে অনেকটা নীরব হয়েই রয়ে গেল দুজন, বিশেষ করে জহুরা জেসমিনের তখন কথা বলার কোন মানসিকতাই ছিল না।

পরের স্টেশানে এসে দেখা গেল, জামাল মিয়ারা আসলেই আসেনি। গোটা প্ল্যাটফরম ঘুরে আর বিভিন্ন কামরায় উঁকি দিয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এলো সালাউদ্দীন। ফিরে এসে সে জহুরা জেসমিনকে বললো, না মেম সাহেব, কোথাও ওদের সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রকৃতপক্ষেই ওরা আসেনি।

জহুরা জেসমিন চমকে উঠে বললো, আসেনি? সেকি! একা আমি অত দূরে যাবো কি করে?

সালাউদ্দীন বললো, তাই তো, সত্যিই ভাবনার কথা।

ভাবনার কথা নয়? এই রাত্রিকালে নির্জন এই কামরায় বসে একা একা আমার যাওয়া কি সম্ভব? আমি কি করি, বলোতো?

একটু চিন্তা করে সালাউদ্দীন বললো, ঠিক আছে মেম সাহেব। চলুন, আমি আপনার সাথে যাবো।

বিস্মিত নেত্রে চেয়ে জহুরা জেসমিন বললো, তুমি আমার সাথে যাবে।

সালাউদ্দীন নির্দ্বিধায় বললো, জি। আপনার নিরাপত্তা বিধানের জন্যেই তো ওদের দরকার ছিল। সে কাজটা আমিই করবো।

তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান করবে? মানে, তুমি আমার সাথে যাবে? সারা রাত আমার সাথে এই কামরায় থাকবে?

জি।

অসম্ভব! সেটা হবে না।

হবে না?

না, কখখনো হতে পারে না।

হতে পারে না? কেন, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

না, পারছিনে।

সালাউদ্দীন আহত কণ্ঠে বললো, মেম সাহেব!

কোন জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগলো জহুরা জেসমিন। ভাবতে লাগলো, আসলেই কি বিশ্বাস করা সম্ভব? নামাজী আর সৎ লোক হলে কি হবে, সে একজন টগবগে যুবক। যৌবনের তাড়নার একেবারে উর্ধ্বে সে নয়। এ রকম সুযোগে সাধু-দরবেশ মানুষের চরিত্রের স্খলন ঘটা অসম্ভব নয় আর এতো একেবারেই এক সাধারণ যুবক। নির্জন কামরায় একা একা তার সাথে! কখন কি দুর্মতি ঘটবে তার কে বলতে পারে? সে ক্ষেত্রে ইজ্জত রক্ষা করাটা তো খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।

একটু থেমে জহুরা জেসমিন পুনরায় ভাবতে লাগলো, ইজ্জতের প্রশ্ন ছাড়াও তো আরো চিন্তা আছে। সাথে প্রায় বিশ হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার। এটা যদি কেড়ে নিয়ে সে চম্পট দেয়, তাহলে তো সেটাও ঠেকানো সম্ভবপর হবে না। আপাতদৃষ্টিতে নির্লোভ হলে কি হবে? দুচার টাকার বকশিশ নিতে অনীহা দেখালেও বিশ হাজার টাকার দাঁও সে ছেড়ে

দেবে, এটা ভাবাও মুর্খতা। পেটের দায়েই তো সামান্য বেতনের নকরী করতে এসেছে এ বাড়িতে। সে যা বেতন পায়, তাতে বিশ বছরের বেতন একত্র করলেও বিশ হাজার টাকা হবে না। এক দাঁও মারলেই তার জীবনের কামাই হয়ে যাবে যেখানে, সেখানেও সে নির্লোভ হয়ে বসে থাকবে চুপচাপ, এমনটি ভাবাই বাতুলতা।

ইতিমধ্যেই ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলো। জেসমিনকে দীর্ঘক্ষণ নীরব দেখে সালাউদ্দীন ফের প্রশ্ন করলো, কি হলো মেম সাহেব, আমাকে একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছেন না?

হুঁশে এলো জহুরা জেসমিন। হুঁশে এসেই সে দেখলো, ট্রেনটা চলে যাচ্ছে এ স্টেশান থেকে। এটা দেখে সে আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, না না, পারছিনে। পারা সম্ভব নয়।

তাহলে কি করবেন?

এখানে নামাটা হলো না যখন এর পরের স্টেশানেই নেমে পড়বো।

নেমে পড়বেন!

অপেক্ষা করবো ফিরতি ট্রেনের জন্যে। ফিরতি ট্রেন এলেই বাড়িতে ফিরে যাবো। যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানে আর যাবো না।

ফিরতি ট্রেন আসাতে তো অনেক সময় লাগবে। এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে ওদিক থেকে এদিকে আসার আর কোন ট্রেন নেই।

তা না থাক, এক-দেড় ঘণ্টা পরে তো আসবে!

সামনের স্টেশানে নেমে সে সময়টা ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দেবো।

তাহলে আর আপনার সামনের স্টেশানে নামাটা ঠিক হবে না মেম সাহেব। একান্তই যদি নামতে চান, তাহলে আপনাকে নামতে হবে সামনের স্টেশানের পরের স্টেশানে।

সতর্ক দৃষ্টি মেলে জহুরা জেসমিন প্রশ্ন করলো, মতলব? সামনের স্টেশানে না নেমে পরের স্টেশানে নামবো মানে? উদ্দেশ্য কি তোমার?

সালাউদ্দীন বললো, আমার কোন উদ্দেশ্য নেই মেম সাহেব! এই সামনের স্টেশানটা একেবারেই একটা ফালতু স্টেশান। পড়ো বাড়ির মতো গ্রামগঞ্জের একটা ছোট্ট স্টেশান। সব ট্রেন থামেও না ওখানে।

তারপর?

স্টেশান মানে ছোট্ট একটা ঘর। সেই ঘরে স্টেশান মাস্টার বসেন আর তিনি নিজেই টিকিট বিক্রি করেন। হাতে গোণা পাঁচ দশজন প্যাসেঞ্জারই

মাত্র যাতায়াত করে এই স্টেশান দিয়ে। কোন ওয়েটিং রুম নেই বললেই চলে। আমি একবার ঐ স্টেশানে নেমে দেখেছি। ওয়েটিং রুমের নামে ছোট্ট একটা টিন শেডের ছাউনি আছে বটে, কিন্তু না আছে সেখানে শক্ত জানালা, দরোজা, না আছে কোন বাথ্‌রুম। বাইরের একটা ভাঙা ল্যাট্রিনে যাত্রীরা তাদের নিতান্তই প্রয়োজনগুলো মেটায়। ঐ স্টেশানে নামলে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন।

জহুরা জেসমিন শক্ত কণ্ঠে বললো, পড়ি পড়বো। তবু আর এগুবো না। এক-দেড় ঘণ্টার ব্যাপার তো? স্টেশানের কর্মচারীদের সাথে কথা বলেই কাটিয়ে দেবো।

জিদ ধরলো জহুরা জেসমিন। সালাউদ্দীনের শত নিষেধ সত্ত্বেও ট্রেন ঐ সামনের স্টেশানে এলে সেখানেই নেমে পড়লো জহুরা জেসমিন। বাধ্য হয়ে সালাউদ্দীনকেও নামতে হলো সেখানে।

সালাউদ্দীনের বিবরণই ঠিক। একেবারেই পড়ো বাড়ির মতো একটা স্টেশান এটা। কোন এক ক্ষমতাধরের ক্ষমতার প্রভাবে এখানে স্থাপিত হয়েছে স্টেশানটি। অল্প দিনেই ক্ষমতাধরের ক্ষমতাটা চলে গেলে স্টেশানটি এতিম হয়ে গেছে। তারপরে আর কোন উন্নতি এর হয়নি।

ট্রেন থেকে নেমে তারা দেখলো, চারদিকেই অন্ধকার। ছোট্ট স্টেশান ঘরটির মধ্যে টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছে। স্টেশান ঘরের বাইরে একটা উঁচু পোলের মাথায় ভূতের আলোর মতো বাল্‌ব জ্বলছে একটা। সে আলোতে স্টেশানের চত্বরটা মোটেই তেমন আলোকিত হয়নি। আকাশে জ্যোৎস্না থাকলেও সারা আকাশে মেঘ থাকায় জ্যোৎস্নাটা ঢাকা পড়ছে বারবার। এতে করে আধো আলো আধো আঁধারের মধ্যে www.boighar.com স্টেশানের চত্বরটাই দেখা যাচ্ছে কেবল। এর বাইরের এলাকায় জমাট অন্ধকার। জ্যোৎস্নাটা মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে এলে এলাকাটা অল্প একটু আলোকিত হচ্ছে আর তারপরেই ফের ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। আশে পাশে কোন লোকবসতি বা গ্রামগঞ্জ নেই। স্টেশান ঘরের ভেতরে যে আলোটা জ্বলছে, সেটা লণ্ঠনের আলো, না ইলেকট্রিক বাল্‌ব, দূর থেকে উপায় নেই তা ঠাওর করার।

বইঘর.কম ও রোকন

সালাউদ্দীন আর জহুরা জেসমিনদের সাথে ট্রেন থেকে আরো জনা দুয়েক প্যাসেঞ্জার নামলো এবং তারা সিধা স্টেশান ঘরের পেছনে গিয়ে অপেক্ষমান গরুর গাড়িতে চড়ে কাঁচা পথে রওনা হলো দূরবর্তী গ্রামের দিকে। গাড়ির হেড লাইটের মতো গরুর গাড়িটির মাথায় ঝুলানো একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো অবিরাম দুলতে দেখা গেল কিছুক্ষণ। গরুর গাড়িটি এদের জন্যে এসে অপেক্ষায় ছিল না, বরং এমন দু'একটা গরুর গাড়ি এখানে বিদ্যমান থাকে, তবে এ খবর জানা ছিল না জহুরা জেসমিনদের। পরে তারা খবর করে জেনেছিল, কালেভদ্রে দুই একটা গরুর গাড়ি পাওয়া গেলেও আজ আর কোন গরুর গাড়ি নেই।

টিকিট বিক্রি করা কাউন্টারের সামনে বারান্দার মতো ছোট্ট একটা শেড্ ছিল টিনের। এই শেড্ বা ছাউনিটাই প্যাসেঞ্জারদের একমাত্র ও সাময়িক আশ্রয়, যদিও কাঠের বা সিমেন্টের কোন বেঞ্চ নেই সেখানে। ট্রেন থেকে নেমে জহুরা জেসমিন ও তার পিছে পিছে সালাউদ্দীন এসে ঐ শেডের নীচে দাঁড়ালো। কোন দিকে না গিয়ে অনেকক্ষণ যাবত তাদের ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্টেশানের পিয়ন গোছের এক কর্মচারী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, এখানে কোথায় যাবেন আপনারা?

জবাবে জহুরা জেসমিন বললো, না, যাবো না কোথাও। ওদিক থেকে ট্রেন এলে যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকেই ফিরে যাবো।

কর্মচারীটি বললো, সেকি! ফিরে যাবেন তো এলেন কেন?

ভুল হয়েছে। ভুল করে এসেছি। তা থাক সে কথা। ওদিক থেকে মানে ফিরতি ট্রেন কখন আসবে বলতে পারেন?

সে তো প্রায় দেড় দুই ঘণ্টার ব্যাপার। এতক্ষণ আপনারা অপেক্ষা করবেন এখানে?

করতেই হবে, নইলে আর যাবো কোথায়?

তাহলে ঐ যে একটু দূরে ঐ ওয়েটিং রুমে যান। এতক্ষণ তো দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। বাইরে কোথাও কোন বসার জায়গা নেই।

ওয়েটিং রুমে বসার জায়গা আছে?

কর্মচারীটি ইতস্তত করে বললো, হ্যাঁ আছে। একটা বড় হেলানো বেঞ্চ আছে। তবে...!

তবে?

বইঘর.কম ও রোকন

এখানে ওয়েটিং রুমে থাকার মতো কোন প্যাসেঞ্জার আসে না তো, তাই অনেক দিন ধরে ওয়েটিং রুমটা অব্যবহৃত আছে আর তাতে করে বেঞ্চটায় কিছুটা ধুলো-বালি পড়ে থাকতে পারে। এছাড়া ঘরের বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে আছে সেই সপ্তাহ দেড়েক আগে থেকে। স্টেশান মাস্টারকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি, তবু বাল্‌বটা কেনাতে পারিনি।

বলেন কি! দেড় সপ্তাহ যাবত ঘরে বাল্‌ব নেই, তবু বাল্‌ব কেনার গরজ বোধ করলেন না স্টেশান মাস্টার সাহেব।

না। আসলে গরজটা তো তেমন একটা নেইও। ওয়েটিং রুমে থাকার মতো প্যাসেঞ্জার দিনেই আসে না, রাতের তো কথাই নেই।

তাই? তাহলে?

ভাববেন না। আকাশে জ্যোৎস্না আছে। পুব দিকের জানালাটা খুলে দিলে ঘরটা অনেকখানি আলোকিত হবে।

জ্যোৎস্নার আলো? কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আকাশে যে হারে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে, তাতে জ্যোৎস্নাটা তো এখনই মেঘে ঢেকে যাবে।

তা যাক। গরমের দিনে অসময়ের মেঘ। এক পশলা বৃষ্টি ঝরলেই আকাশটা আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই সময় স্টেশান মাস্টারের ঘরের ভেতর থেকে ডাক এলো, মারফত আলী...!

জবাবে জি স্যার, আসি! বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো মারফত আলী নামের ঐ রেলওয়ে কর্মীটি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে জহুরা জেসমিন নাখোশ কণ্ঠে সালাউদ্দীনকে বললো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পিছু যখন ছাড়ছোই না, তখন ওয়েটিং রুমের বেঞ্চটা ঝেড়ে মুছে দিয়ে এসো, সেই সাথে জানালাটাও খুলে দিয়ে এসো। জলদি করো, কোমর আমার ধরে গেছে।

সালাউদ্দীন বললো, জি মেম সাহেব, দিচ্ছি।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে সালাউদ্দীন পুব দিকের জানালাটা খুলে দিতেই অনেকখানি আলো এসে পড়লো ঘরে। সেই আলোতে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে সে দেখলো, হেলানো বেঞ্চটাতে ধুলো কিছুটা থাকলেও অধিক ধুলো জমেনি। পকেটের রুমাল দিয়ে সে ধুলোটুকু মুছে দিয়ে সালাউদ্দীন ডাক দিলো, আসুন মেম সাহেব, মুছে দিয়েছি ধুলো।

বইঘর.কম ও রোকন

ওয়েটিং রুমে ঢুকেই জহুরা জেসমিন বেঞ্চটার ওপর তার বেডিংটা বিছালো। তার পরে সালাউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললো, ঠিক আছে, তুমি এখন বাইরে যাও আর দূরে কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করোগে।

সালাউদ্দীন বললো, জি মেম সাহেব, বাইরে যাবো তো নিশ্চয়ই, তবে দূরে যেতে পারবো না।

সন্দিগ্ধ নয়নে চেয়ে জহুরা জেসমিন বললো, কেন? দূরে যেতে পারবে না কেন?

কেন আবার, দেখছেন না জায়গাটা কেমন নির্জন?

আমি দূরে গিয়ে থাকবো আর এই রাত্রিকালে কেউ এসে আপনার ওপর হামলা চালালে আপনাকে রক্ষে করবে কে?

তাহলে কোথায় থাকবে?

এই দরোজার কাছেই।

জহুরা জেসমিন বিরক্তির সাথে বললো, উহ্ মরণ!

যাও, যেখানে ইচ্ছে থাকোগে। আমি দরোজাটা বন্ধ করে দিই বলেই দরোজার কাছে এসে জহুরা জেসমিন ফের হতাশ কণ্ঠে বললো, ওমা, এ কি? বাইরের দিক দিয়ে লাগানো এক পাল্লার দরোজা আর ভেতর থেকে বন্ধ করার কোন ব্যবস্থাই নেই।

আবার সে সালাউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললো, দেখো তো বাইরের দিকে কোন শেকল বা ছিটকিনি আছে কিনা?

সালাউদ্দীন বললো, না মেম সাহেব, দরোজার পাল্লাটা বাইরের দিকে হলেও আটকানোর কোন ব্যবস্থা নেই। ছিটকিনি একটা আছে বটে, তবে সে ছিটকিনিটা আটকানো যাবে না কারো সাথে।

কেমন?

আগে হয়তো ছিটকিনিটা আটকানোর কোন বাঁকানো লোহা-টোহা কিছু ছিল। এখন সে সব উপড়ে কোথায় চলে গেছে, তা কে জানে?

জহুরা জেসমিন শংকিত কণ্ঠে বললো, সেকি!

সালাউদ্দীন বললো, কোন চিন্তা করবেন না আপনি নিশ্চিন্তে আরাম করুন। দরোজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে আমি পাল্লায় ঠেস্ দিয়ে বসে পড়ছি। সহজে ঢুকতে পারবে না কেউ।

জহুরা জেসমিন খেদের সাথে স্বগতোক্তি করলো, কী মুসিবত!

জড়সড় হয়ে বেঞ্চে পাতা বিছনার ওপর বসে পড়লো জহুরা জেসমিন। কেটে গেল ঘণ্টা খানেক সময়। এর পরেই মারফত আলী নামের স্টেশানের ঐ রেলকর্মীটি দ্রুত পদে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, এই যে আপনারা জেগে আছেন তো? আপনাদের জন্যে মস্ত বড় দুঃসংবাদ আছে।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো সালাউদ্দীন। কথাটা কানে পড়তেই জহুরা জেসমিনও বেঞ্চ থেকে উঠে ছুটে এলো দরোজায়।

সালাউদ্দীন বললো, দুঃসংবাদ! সেকি।

মারফত আলী বললো, দুঃসংবাদ মানে এ রাতে আর কোন ট্রেনই কোন দিকে যাতায়াত করবে না। এই সামনের স্টেশানের আগের স্টেশানের কাছে একটা মালগাড়ি এসে উল্টে গেছে। তার ফলে রেল লাইনের কয়েকটা স্লিপারও উঠে গেছে। ঐ মাল ট্রেনটা সরানো আর ঐ স্লিপারগুলো ঠিক করা এই রাতে আর সম্ভবপর হবে না। যদি হয়ও গোটা রাতটাই লাগবে।

সালাউদ্দীন বললো, তার মানে? এই রাতে আর তাহলে আমাদের ফিরে যাওয়ার ট্রেন আসবে না?

মারফত আলী বললো, না। কোন ট্রেনই কোন দিকে যাতায়াত করবে না। আপনাদেরটাও না।

বলেন কী?

সেই কথাই বলতে এসেছি আপনাদের। আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন। রাতে আর কোন ট্রেন না থাকায় আলো নিভিয়ে দিয়ে আর স্টেশান ঘর বন্ধ করে আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। এই স্টেশানে একমাত্র আপনারা দুজন ছাড়া আর কেউ থাকছে না। কাজেই জেগে থাকবেন সব সময়, ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন!

বলেই ফের দ্রুত পদে চলে গেল মারফত আলী। শংকিত নেত্রে চেয়ে জহুরা জেসমিন দেখলো, সত্যি সত্যিই নিভে গেল স্টেশান ঘরের আলো। আর স্টেশান মাস্টারসহ স্টেশানে যে দুই তিনজন লোক ছিল, স্টেশান ঘরটা বন্ধ করে চলে গেল তারা।

তা দেখে ডুকরে উঠলো জহুরা জেসমিন। কপালে করাঘাত করে বললো, ও মাগো, শেষ পর্যন্ত এই আমার কপালে ছিল! এমন মুসিবতে পড়বো। আমি তা কি কখনো ভেবেছি? কী যে লেখা আছে আজ কপালে...!

বইঘর.কম ও রোকন

সালাউদ্দীন সান্ত্বনা দিয়ে বললো, ভয় নেই মেম সাহেব! আমি তো আছি। আমার জীবন থাকতে...!

বাধা দিয়ে জহুরা জেসমিন বললো, থাক...! তোমাকে আর ভরসা দিতে হবে না। দরোজার পাল্টাটা ভিড়িয়ে দিয়ে তুমি সরে পড়ো এখান থেকে-এইটেই আমি চাই।

www.boighar.com

সেকি! সরে পড়বো?

হ্যাঁ পড়বে। তোমাকে আমার দরকার নেই।

বলতে বলতে গহনার বাক্সটি আঁকড়ে ধরে ফের বেঞ্চের ওপর জড়সড় হয়ে বসে পড়লো জহুরা জেসমিন। বসে পড়ে কেবলই সে কাঁপতে লাগলো থরথর করে। কাঁপতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো, আজ তার রক্ষে নেই। সালাউদ্দীনের হাতেই সর্বস্ব তার খোয়া যাবে আজ। এখন যে কোন মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সালাউদ্দীন। তার ইজ্জত তো লুটে নেবেই, তাকে খুন করলেও এই জনহীন স্থানে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই। সেই সাথে এই গহনার বাক্সটাও নিয়ে সে চম্পট দেবে নির্ঘাত। এত বড় দাঁও কোন পাগলেও ছাড়বে না। হায়-হায়-হায়! আজ তার গহনা আর ইজ্জত তো যাবেই, জানটাও যেতে পারে সেই সাথে।

জহুরা জেসমিন কাঁপতে লাগলো।

আর আহাজারী করতে লাগলো মনে মনে। সালাউদ্দীন সেটা লক্ষ করতে গেল না। দরোজার পাল্লাটা ভিড়িয়ে দিয়ে আবার সে বসে পড়লো পাল্লায় ঠেস্ দিয়ে।

গহনার বাক্সটা আঁকড়ে ধরে অত্যন্ত সতর্ক অবস্থায় বসে রইলো জহুরা। সব সময় তার মনে হতে লাগলো, এই এখনই বুঝি সালাউদ্দীন এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর! এই এখনই বুঝি সালাউদ্দীনের সাথে জীবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে তাকে।

সর্বক্ষণ এই আতংক নিয়ে বসে রইলো সে। নজর তার অনুক্ষণ দরোজার দিকে নিবদ্ধ। ভয়ে আর ভ্যাপ্সা গরমে সে ঘামতে লাগলো অবিরাম।

কাটতে লাগলো সময়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সালাউদ্দীন হামলা করবে এখনই! এই অপেক্ষা করতে করতে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলো জহুরা জেসমিন।

মাঝরাতের দিকে বৃষ্টি নামলো মুষলধারে। বৃষ্টির সাথে বাতাস। কেটে গেল ভ্যাপসা গরম। ঠাণ্ডা হলো ওয়েটিং রুম। ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত শরীরে ঠাণ্ডার আমেজ লাগায় অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো জহুরা জেসমিন। দেহ তার এলিয়ে পড়লো বিছানায়। ক্লান্তির পর ঘুম। ফলে অচিরেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

কতক্ষণ ধরে সে ঘুমিয়ে আছে সেটা ঠাওর করার সাধ্য তার ছিল না। তার ঘুম ভাঙলো স্টেশান ঘরের ঢং ঢং করে বিপুল শব্দে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ায়। ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতেই বিদ্যুৎ বেগে বিছানার ওপর উঠে বসলো জহুরা জেসমিন। উঠে বসেই সে ব্যস্তভাবে খোঁজ করলো তার গহনার বাক্সের। বাক্সটা তার কোলের কাছেই ছিল। ক্ষিপ্র হস্তে তা তুলে নিয়ে সেটা সে চেপে ধরলো তার বুকের সাথে। এরপরেই সে বাক্সটা খুললো। দেখলো, না, একটা গহনাও খোয়া যায়নি। সব ঠিক আছে।

আশ্বস্ত হয়ে এবার সে সামনের দিকে চাইলো। দেখলো, অন্ধকার পুরোটাই কেটে গেছে। সারা ঘর ফরসা। দেখলো, পুব দিকের খোলা জানালা দিয়ে ভোরের সূর্যের আলো সরাসরি ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। এবার সে বুঝতে পারলো সকাল হয়ে গেছে আর এ কারণেই ঘরের ভেতর আর আঁধার নেই। এটা বুঝতে পেরেই তার খেয়াল হলো এখনই তো ঘণ্টা পড়লো ট্রেনের। তবে কি স্টেশানের কর্মচারীরা সব এসে গেছে? এমনাট মনে হওয়ার সাথে সাথে সে নেমে এলো তার বিছানা থেকে। ঘটনা কি, তা জানার জন্যে সে ছুটে এসে জোরে ধাক্কা মারলো বাইরের দিক থেকে ভিড়িয়ে দেয়া দরোজার পাল্লায়।

সংগে সংগেই খুলে গেল দরোজা আর দরোজায় হেলান ছিয়ে বসে থাকা সালাউদ্দীন গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। তা দেখেই চমকে উঠলো জহুরা জেসমিন। ভীত কণ্ঠে বলে উঠলো, কে কে?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সালাউদ্দীন বললো, আমি মেম সাহেব! আমি সালাউদ্দীন। হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম কিনা, তাই...!

সালাউদ্দীন চোখ রগ্‌ড়াতে লাগলো। জহুরা জেসমিন প্রশ্ন করলো, ঘুমিয়ে গিয়েছিলে মানে? কোথায় ঘুমিয়ে গিয়েছিলে?

এই এখানেই মেম সাহেব, এই দরোজার সাথে ঠেস্ দিয়েই। সারা রাত জেগে ছিলাম তো, তাই সকালের দিকে চোখটাকে আর কন্ট্রোলে রাখতে পারিনি। একদম এই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি।

বইঘর.কম ও রোকন

জহুরা জেসমিন বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, সেকি সারা রাত জেগে ছিলে কি এখানেই?

জি জি, এই দরোজায় বসেই।

কেন? সরা রাত জেগে ছিলে কেন?

বাহ্! জেগে না থেকে ঘুমিয়ে যাবো কি করে? যদি কোন বদ লোক সেই ফাঁকে ঢুকে পড়ে আপনার ঘরে? মানে চড়াও হয় আপনার ওপর? তাই...!

তাই সারা রাত জেগে ছিলে এখানে?

জি মেম সাহেব, সারা রাতই আর এখানে বসেই। ঘুমটা এসেছে এই একদম ভোরে। ঘণ্টা বাজার মতো কি যেন একটা বাজার শব্দ কানে গেল! খেয়াল করতে গিয়েও আবার ঘুমিয়ে গেছি। সত্যি সত্যিই ঘণ্টা পড়লো নাকি?

এ কথার জবাব দেয়ার সময় ছিল না জহুরা জেসমিনের। ইতিমধ্যেই সে লক্ষ করলো, সালাউদ্দীনের পায়জামাটা গোটাই আর পাঞ্জাবীটার প্রায় অর্ধেকটাই ভেজা। তা লক্ষ করে সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, এ কি! তোমার জামা-কাপড় তো দেখছি সব ভেজা! এগুলো ভিজলো কি করে?

এবার সালাউদ্দীনও বিস্মিত হলো খানিকটা। প্রশ্ন করলো, তার মানে? রাতে যে ভীষণ বৃষ্টি হলো আর সেই সাথে বাতাস—সেটা কি টের পাননি আপনি?

খেয়াল হতেই জহুরা জেসমিন বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা খানিকটা পেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তখন কোথায় ছিলে? ঐ বৃষ্টির সময়?

সালাউদ্দীন বললো, এই দরোজার ওপরই মেম সাহেব! এই দরোজায় ঠেস্ দিয়ে। বৃষ্টির পানিতে সরাসরি পায়জামাটা আর বাতাসের ঝাপটায় পাঞ্জাবীটার অর্ধেটাই ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। এখন আর অবশ্য ততটা ভেজা নেই, অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে।

এই সালাউদ্দীনকে এতখানি অবিশ্বাস করার গ্লানিতে জহুরা জেসমিনের ভেতরে ভীষণ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। লজ্জায় ও অনুতাপে স্থির হয়ে গেল তার দুই চোখের দৃষ্টি। সে থতমত করে বললো, তা বৃষ্টির সময় এখানে থাকলে কেন? টিকিট কাউন্টারের সামনে যে টিনশেড্টা আছে, সেখানে গেলেই তো পারতে!

বইঘর.কম ও রোকন

ঈষৎ হেসে সালাউদ্দীন বললো, পাগল! তখন তো ভয় আরো বেশি। বৃষ্টির জন্যে আমি এখান থেকে সরে গেলে তো চোর-বদমায়েশরা সুযোগ পেয়ে যাবে।

সুযোগ পেয়ে যাবে?

যাবেই তো। কেউ যদি আপনাকে ফলো করে থাকে, বিশেষ করে কোন চোর-চোট্টা যদি আপনার গহনার বাক্সটা লক্ষ করে থাকে, সে ব্যক্তি সুযোগটা ছাড়বে কেন? দরোজায় আমি আছি আর জেগে আছি দেখে একমাত্র ডাকাতের দল ছাড়া, দু'চারজন চোর-ছেঁচ্চোর কি আপনার ঘরে ঢোকার সাহস করতে পারে? কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে আমি সরে গেলেই তো সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা।

পেয়ে যাবে?

আলবত পাবে। বৃষ্টিই হোক আর ঝড়ই হোক, আপনাকে অরক্ষিত রেখে আমি কি এক মুহূর্ত এখান থেকে সরে যেতে পারি? চোর-ডাকাত ছাড়াও কখন কার কি দুর্মতি হয় বলা তো যায় না!

সীমাহীন বিস্ময়ে আর আত্মগ্লানিতে জহুরা জেসমিনের কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। মোহিত হয়েও গিয়েছিল সে সালাউদ্দীনের এই সীমাহীন বিশ্বস্ততায়। সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, মাস্টার সাহেব!

সালাউদ্দীন বললো, যে পরিস্থিতিতেই হোক, আপনার কাছে একমাত্র আমিই যখন রয়ে গেছি তখন তো আর আপনাকে অসহায় রেখে আমি আমার নিজের সুবিধার জন্যে সরে যেতে পারিনে। যতক্ষণ দেহে আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আপনাকে হেফাজত করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। এর কিঞ্চিৎ গাফিলতিও আমার ঈমানদারিতে মস্ত বড় দাগ ফেলতে যথেষ্ট।

জহুরা জেসমিনের মুখের ভাষা তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল তামামই। অনেক চেষ্টায় সে কোনমতে স্বগতোক্তি করলো, তাজ্জব!

এই সময় মারফত আলী নামের স্টেশানের ঐ কর্মচারীটি দ্রুত এগিয়ে এসে বললো, আরে এই যে আপনারা জেগে আছেন? আসুন, আসুন আপনারা নাকি ফিরে যাবেন? আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনাদের সেই ফিরে যাওয়ার ট্রেনটা এই স্টেশানে পৌঁছে যাবে।

শুনে সালাউদ্দীন খোশ কণ্ঠে বললো, তাই নাকি? তাহলে লাইন ক্লিয়ার হয়েছে!

বইঘর.কম ও রোকন

মারফত আলী বললো, হ্যাঁ, হয়েছে। ব্যাপক তৎপররতা চালানোর ফলে রাতারাতিই মালগাড়িটা সরিয়ে ফেলে লাইনের স্লিপারগুলো ঠিক করা হয়েছে। সামনেই আটকে ছিল আপনাদের ট্রেনটা। এখন সেটা আসছে।

জহুরা জেসমিন ইতিমধ্যেই নিজেকে কিছুটা সংযত করে নিলো। মারফত আলীর খবরের প্রেক্ষিতে সে সালাউদ্দীনকে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, চলে, চলো আর তাহলে দেরী নয়, টিকিট কেটে নিয়ে আমরা রেডি হই, চলো...!

জহুরা জেসমিন ক্ষিপ্র হস্তে তার বেডিং গুছিয়ে নিতে লাগলো। সালাউদ্দীন এই সময় আপন খেয়ালেই বলে বসলো, আপনাদের সেই আত্মীয়ার মেয়েটির দুর্ভাগ্য। বিয়েতে সে আপনাদের গহনাগুলো আর পেলো না।

কণ্ঠে জোর দিয়ে জহুরা জেসমিন বললো, পাবে না কেন? তার শাদি তো আজ নয়, আরো দুদিন পরে। আজকের সারা দিন, সারা রাত আর পরের দিনটা গোটাই বিশ্রাম নেয়ার পর আগামীকাল সন্ধ্যায় আবার আমি ঐ একই ট্রেনে রওনা হবো সেখানে।

আবার রওনা হবেন?

জি, আবার রওনা হবো আর তুমিও রওনা হবে আমার সাথে।

আমি?

জি তুমি! একমাত্র তুমিই সাথে যাবে আমার। অন্য কাউকেই আর আমার দরকার নেই।

মেম সাহেব!

কোথাও আর কামরার বাইরে নয়, অত:পর কামরার ভেতরেই আমার কাছে কাছে থাকবে তুমি।

৪

জহুরা জেসমিনের আত্মীয়ার মেয়ের বিয়েতে গহনা পৌঁছাতে গিয়ে সালাউদ্দীনের মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছিল অপরিসীম লজ্জায়। ঐ বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে সালাউদ্দীনের চোখমুখ আবার লাল হয়ে গেল নিদারুণ ক্রোধে।

বইঘর.কম ও রোকন

সালাউদ্দীনকে সাথে নিয়ে যে মেয়ের শাদিতে জহুরা জেসমিন গহনা দিতে গিয়েছিল সেই মেয়ের আম্মা অর্থাৎ সেই আত্মীয় সম্পর্কে জহুরা জেসমিনের ফুফু। সম্পর্কটা যথেষ্টই ঘনিষ্ঠ আর ফুফুর অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই কমজোর হওয়ায় জহুরা জেসমিনেরা মেয়েটার মায়ের দেয়া স্বল্প গহনার সাথে মেয়েটাকে এই গহনাগুলো উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

জহুরা জেসমিনের সাথে গহনা পৌঁছানোর জন্যে এই বিয়ে বাড়িতে এসে সালাউদ্দীনকে যে পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তাতে তার ভীষণ লজ্জা পাওয়ার কারণ ছিল যথেষ্ট। কোন বিয়ে-শাদিতে যাওয়া মানেই কিছুটা সাজগোজ করে যাওয়া। ফ্যামিলি স্ট্যাটাস অর্থাৎ পারিবারিক ওজন বজায় রাখার খাতিরেই জহুরা জেসমিন কিছুটা সাজগোজ করতে বাধ্য করেছে সালাউদ্দীনকে। এমনিতে সালাউদ্দীন এক অতি সুন্দর যুবক। অল্প কিছু সাজগোজ করার ফলে তার সৌন্দর্যের মাত্রা গেল কয়েক গুণ বেড়ে। পাশাপাশি আর তাকে কর্মচারী ভাবার কোন সুযোগ কারো রইলো না। আর এসবই হলো সালাউদ্দীন ও জহুরা জেসমিনের জন্য নতুন এক বিড়ম্বনার কারণ।

পরিচিত আর একাধিক কোন লোক ছাড়া একমাত্র সালাউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রিকালে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসায় জহুরা জেসমিনের ফুফুজান বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন আর নানা রকম কৌতূহলের পয়দা হলো তার বাড়িতে। অত্যন্ত সুন্দর আর সুন্দরী এই দুই যুবক-যুবতীকে এক সাথে দেখে এ বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে আগত যুবতীরা হাঁ করে চেয়ে রইলো এদের দুজনের দিকে। একজন তো এদের মুখের সামনে বলেই বসলো, ওমা! কী সুন্দর জুটি গো! একদম মাণিকজোড়! কি গো খালা, এইটেই বুঝি জহুরা আপুর বর?

সালাউদ্দীনের দিকে ইংগিত করলো তরুণীটি।

জহুরার ফুফু আম্মা মুখ তুলে চাইতেই লাগালাগি প্রশ্ন করলো ফুফুজানের প্রতিবেশিনী। বললো, সেকি লো বুবুজান, কে বলে সুঅন্ন আর সুব্যঞ্জন এক সাথে মেলে না? এই যে হালফিল মিলে গেছে!

আহারে! কী দর্শনধারী জুটি গো! হালে বিয়ে হয়েছে বুঝি?

এই প্রতিবেশিনীটাও আঙ্গুল তুললো সালাউদ্দীন ও জহুরা জেসমিনের দিকে। জবাবে জহুরা জেসমিনের ফুফুজান কি বললেন, তা শোনার মতো

অবস্থা তখন সালাউদ্দীন ও জহুরা জেসমিনের ছিল না। এসব কথা কানে পড়তেই লজ্জায় লাল হয়ে তারা দুজন সেখান থেকে পালিয়ে তবে বাঁচলো।

জহুরা জেসমিনের ফুফুটাও এক সময় জহুরা জেসমিনকে ঘরের মধ্যে একা পেয়ে প্রশ্ন করলেন, ছেলেটা কেরে মা? এত দূরের রাস্তা এই রাত্রিকালে একমাত্র এই ছেলেটাকে সাথে নিয়ে চলে এলে, এর সাথেই বুঝি শাদিটা তোমার পাকা হয়ে আছে?

জবাবে জহুরা জেসমিন নির্দ্বিধায় বললো, জি ফুফু আম্মা, ব্যাপারটা তাই।

বলেই জহুরা জেসমিন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো স্মিতহাস্যে। এই সময় ঘরের বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল সালাউদ্দীন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সালাউদ্দীনকে দেখে এবার সত্যি সত্যিই লজ্জা পেলো জহুরা জেসমিন। লজ্জায় সে সংগে সংগে সরে গেল বারান্দা থেকে।

একটু পরেই জহুরাকে আড়ালে পেয়ে সালাউদ্দীন প্রশ্ন করলো, সেকি মেম সাহেব, আপনার ফুফুর প্রশ্নের জবাবে আপনি ও কথা বললেন কেন?

জহুরা জেসমিন সংক্ষেপে আর শক্ত কণ্ঠে বললো, ও কথা না বললে ওদের সীমাহীন কৌতূহল সহজে নিবৃত্ত করা যেতো না।

অত:পর এই বিয়ে বাড়িতে জহুরা জেসমিনের সাথে সালাউদ্দীন যে দুদিন থেকেছে, সেই দুদিনই মাঝে মাঝেই তার মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে শরমে। তার কানে পড়েছে বেশ কিছু নাজুক মন্তব্য। বাড়ির বাইরে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করার সময়ও তাকে শুনতে হয়েছে কৌতূহলী তরুণীদের আবেগপূর্ণ কথোপকথন: ঐযে দ্যাখ্ দ্যাখ্, ঐ ছেলেটার সাথেই শাদি হবে ও বাড়িতে বেড়াতে আসা মেয়েটা মানে ঐ জহুরা জেসমিনের! কী সুন্দর বর পাবে জহুরা জেসমিন, তাই না?

জবাবে অন্যেরা বলেছে, পাবেই তো!

ঐ জহুরা জেসমিনটাও তো আর কম সুন্দরী নয়। এমন বর না হলে কি মানায় ঐ জহুরা জেসমিনকে?

অথচ সালাউদ্দীন জহুরা জেসমিনদের নওকর। লজ্জায় লাল হতে এমন মন্তব্যের অধিক সালাউদ্দীনের আর লাগে কি! পুলক বোধের উপাদানটাও তার কম হয় কিসে?

ঐ বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসার কয়েক দিন পরে হঠাৎ এক আজব বাবু এসে হাজির হলেন জহুরা জেসমিন তথা মীর সাহেবের বাড়িতে। লক্ষ তার মীর সাহেবের ব্যাংক ব্যালান্স, উপলক্ষ জহুরা জেসমিন। জহুরাকে শাদি করবে।

এ বাড়িতে এসে সালাউদ্দীনকে দেখেই এই আজব বাবুর মেজাজ গেল বিগড়ে। এত সুন্দর চেহারার এমন লক্‌লকে এক নওজোয়ান এ বাড়িতে থাকবে, এটা তার বড়ই না-পছন্দ। দেখামাত্রই এই বাবু সাহেব সাব্যস্ত করে ফেললেন, যেভাবেই হোক এ বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে ব্যাটাকে। পরে যখন জানলেন, সালাউদ্দীনের এ বাড়িতে কোন অধিকার বা আধিপত্য নেই, এখানে সে একজন কর্মচারী তথা নওকর মাত্র, তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হলো মেজাজ তার। তাড়ানোর বদলে তার এবার খাহেশ হলো, কড়া শাসন আর ধিক্কার-ধমকের মাধ্যমে এই মাকাল ফলটাকে তার পয়জারের নফর অর্থাৎ পাদুকা বাহক বানানোর।

তাই এ বাড়িতে আসার পরের দিনই বাবু সাহেব সালাউদ্দীনের ঘরের সামনে এসে তম্বিতম্বা শুরু করলেন। হাঁক দিয়ে বললেন, আরে এই ব্যাটা গোলামের বাচ্চা গোলাম, ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আরাম করা হচ্ছে! বেরিয়ে এসো হারামজাদা, বেরিয়ে এসে গতরটা একটু খাটাও।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সালাউদ্দীন। বললো, জি, আমাকে কিছু বলছেন?

বানর মাফিক মুখ খিঁচিয়ে বাবু সাহেব বললেন, জি হ্যাঁ! তোমাকে নয়তো কি খেঁদির মাকে বলছি রে ব্যাটা কুঁড়ের হদ্দ? একটা কাজ করো দেখি? আমার এই জুতো জোড়া এখনই নিয়ে গিয়ে বাজার থেকে কালি করে আনো তো? দৌড়ের ওপর যাবে আর দৌড়ের ওপর আসবে। দেরী কিন্তু সহ্য করিনে আমি, বুঝেছো ব্যাটা কুঁড়ের বাদশাহ!

হতভম্ব কণ্ঠে সালাউদ্দীন বললো, জি, মানে?

বাবু সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, ফের মানে? মানে কিরে নফরের বাচ্চা নফর। পাইট খাটতে এসে এত মানে মানে করছো কেন? যা বলছি তাই করো। এই যে, এগিয়ে এসে আমার পা থেকে খুলে নাও এই জুতো জোড়া।

বইঘর.কম ও রোকন

বলে সালাউদ্দীনের দিকে পা বাড়িয়ে ধরলো বাবু সাহেব।

সালাউদ্দীন দাঁড়িয়ে রইলো অনড় হয়ে। তা দেখে বাবু সাহেব ফের তিরিক্কি কণ্ঠে বললেন, তবু হাঁ করে চেয়ে রইলে যে! কথার অবাধ্য হলে জুতিয়ে তোমার মুখের শেপ্ পাল্টে দেবো শুয়োরের বাচ্চা! খুলে নাও পায়ের জুতো। নকরী করতে এসে মানে বাঁধছে বুঝি? খুলে নাও...!

ক্রোধে এবার লাল হয়ে গেল সালাউদ্দীনের মুখমণ্ডল। মাথায় আগুন ধরে গেল তার। ইচ্ছে হলো, কড়া থাপ্পড় মেরে এই উল্লুকটার কয়েকটা দাঁত মাটিতে ফেলে দিতে। কিন্তু নেহায়েত নকরীটা ধরে রাখার গরজেই সেটা করতে সে না পেরে কেবলই কাঁপতে লাগলো ক্রোধে। সেই সাথে ভাবতে লাগলো, লোকটা কি আসলেই সুস্থ মানুষ, না কোন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক? সাহেব-সুবার পোশাক পরিধানকারী এমন বেআক্কল আর বেআদব সে আর কখনো দেখেনি। www.boighar.com

এই সময় জামাল মিয়া কি এক কাজে বাহির বাড়িতে এসেছিল। বাবু সাহেবকে গর্জন করতে দেখে সে এগিয়ে এলো তাদের দিকে। সালাউদ্দীনের দিকে পা বাড়িয়ে ধরে বাবু সাহেব সালাউদ্দীকে জুতো খুলে নেয়ার হুকুম করলে চমকে উঠলো জামাল মিয়া। বিদ্যার দৌড়ে সালাউদ্দীন তার সাথে না পারলেও এ বাড়িতে সালাউদ্দীনের কদর যে বেড়েই চলেছে দিন দিন, বিশেষ করে এ বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী জহুরা জেসমিন এই সালাউদ্দীনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে এখন বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, জামাল মিয়ার এটা না বুঝার কিছুই ছিল না। সুতরাং এমন লোককে এভাবে জুতা খুলে নেয়ার হুকুম করায় জামাল মিয়া চমকে উঠে বললো, আরে এই এই, করো কি, করো কি! কারে কি কইছো, হেডা হুঁশ কইরা কইছো তো?

বলতে বলতে জামাল মিয়া ছুটে এসে সালাউদ্দীনকে পেছনে ফেলে বাবু সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

এতে বিব্রত হলেন বাবু সাহেব। ক্ষেপে গিয়ে বললেন, আরে এই ব্যাটা ঢাকাইয়া বাঙ্গাল, আমার কথার মধ্যে তুমি আবার নাক গলাতে এসেছো কেন? ভাগ্ ব্যাটা! ভাগ্ ভাগ্।

কিছু মাত্র বিচলিত না হয়ে জামাল মিয়া সতেজে বললো, ভাগুম? তুমি হালায় কোন মাল হেডা বুঝতে পারিনি অহন তক। তয়, আমি ভেগে গেলে তোমার নসীবে আজ কি আছে, হেডা ঐ আলেমুল গায়েবই জানেন।

সালাউদ্দীনকে ছেড়ে দিয়ে বাবু সাহেব এবার ধরে বসলেন জামাল মিয়াকে। গলার তেজ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তবেরে ব্যাটা বুড়ো হাব্ড়া! আমাকে 'তুমি' বলার সাহস করো তুমি? জানো আমি কে?

জামাল মিয়া বললো, হেইডা তো বুঝতে পারছিনে গতকাল থেকেই। এ বাড়িতে তোমার যে খানিক পাত্তা আছে হেইডা বুঝতে পারছি। কিন্তু আসলেই তুমি একটা কোন্ কিসিমের চিড়িয়া হেইডা বুঝে উঠতে পারিনি। আইসা অবধি এই যে হুমানে দাপট কইরা বেড়াইতাছো, হেইডা কিসের বলে কও দেহি? এ বাড়ির ওপর তোমার অধিকারটা কি?

অধিকার! ওরে ব্যাটা গণ্ডমূর্খ, আর কয়দিন পরেই যে তোমাদের সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবো আমি, সে খবর কিছু রাখো?

জামাল মিয়া মাথা নেড়ে বললো, না, রাখিনে। কয়দিন পরে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অইবা তো অহন তুমি কী? অহন কোন্ সম্পর্কে এ বাড়িতে এসে উঠেছো?

বাবু সাহেব বুক টান করে বললেন, মেহমান, মেহমান, মস্ত বড় সম্মানজনক মেহমান। দেখছো না, এ বাড়ির মালিক খোদ ঐ মীর সাহেব আর তাঁর বিবি সাহেবা আমাকে কেমন খাতির যত্ন করছেন! তাঁদের নির্দেশে এ বাড়ির চাকর-নফরগুলো কেমন খেদমত করতে শুরু করেছে আমার?

হঁ, হেডা তো বুঝতে পারতাছি। আর হেই জন্যেই বুঝতে পারছিনে তুমি আসলেই একটা কোন্ মাল! তোমার নামটা কি কও দেহি?

আমার নাম? ওরে ব্যাটা বেকুব, বেহুশ! এখন পর্যন্ত আমার নামটাও জানতে পারোনি? আমার নাম মমতাজ উদ্দীন মানিক, ওরফে মানিক বাবু।

এ্যা, মানিক বাবু? হে কালের নবাব সিরাজ দৌলার ভরাডুবীর ভিলেন মানিক চাঁদ বাবুর কোন রিস্তেদার নাকি আপনি?

মানিক চাঁদ বাবু! হেদিন থিয়েটার অইলো ও পাড়ায়। হেই থিয়েটারে দেখলাম, হেকালের নবাবটার কেমন ভরাডুবি কইরা ছাড়লো ঐ মানিক চাঁদ বাবু। হেকী বেঈমানী!

আরে না না, সে কালের কোন মানিক চাঁদ বাবুর আমি কেউ নই। আমি একালের মানিক বাবু।

তয় বাবুডা অইলেন কি সে?

আমি ডাক্তার বাবু, তাই। যারা জানে, তারা আমাকে ডাক্তার বাবু বলে। যারা জানে না, তারা বলে মানিক বাবু।

জামাল মিয়া বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, হেই খাইছে! তুমি ডাক্তার, তা কেউ জানে আবার কেউ জানে না, হেইডা কেমন কথা?

কথাটা হলো, ডাক্তারীটা পুরোপুরি শুরু করিনি এখনো কিনা, তাই সবাই সেটা জানে না। এখন অল্প অল্প করি, পরে পুরোপুরি করবো।

হঁ, কথাডা এবার বুঝলাম। ডাক্তারকে লোকে ডাক্তার বাবু বলবে, হেডা ঠিক। কিন্তু তোমাকে লোকে মানিক বাবু বলবে ক্যান্? তুমি কি অমুসলমান?

আরে দূর ব্যাটা! বোকা পাঁঠা কোথাকার! থানার বড় দারোগা মুসলমান হলেও তাকে সবাই বড় বাবু বলে। থানার দারোগা বাবু হলে আমি হবো না কেন?

ও হের লাইগ্যা তুমি বাবু?

বিলকুল। আমি ডাক্তার, সেজন্যে শুধু ডাক্তার বাবুই নয়, আমাকে বড় বাবু বললেও ভুল হবে না তোমার। থানার দারোগা মানুষ পেটায়, আমি মানুষ বাঁচাই। আমাকে বড় বাবু বলাই কি সবার উচিত নয়?

একটু চিন্তা করে জামাল মিয়া বললো, হঁ, তা তো উচিতই। ডাক্তার বাবু যখন তখন তুমি তো বেশ খানিকটা সম্মানী লোকই তাহলে?

হাড্রেড পারসেন্ট। এতক্ষণে সেটা বুঝতে পারছো। আমার পরনে এই কোট দেখেও সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারোনি?

না পারিনি। আপনার মাথায় ঐ মাংকী ক্যাপ্টা থাকায় আপনার চেহারাডা মাংকী-মাংকী লাগছে তো, তাই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, তয় অহন পারতাছি। একজন ডাক্তার বাবু যখন, তহন আপনি সম্মানী তো অইবেন জরুর। আপনারে আর তুমি বলা ঠিক নয়!

কারেক্ট! একদম কারেক্ট।

তয় বলছিলাম কি, আপনি কোন্ কেসিমের ডাক্তার, হেডা তো অহনও বুঝি নাই। আপনি পাস করা ডাক্তার, না হাতুড়ে?

আঁতে স্যাকা লাগলো মানিক বাবুর। তাই তিনি সদম্ভে বললেন, হাতুড়ে মানে? রীতিমতো ডাক্তারী পড়ে ডাক্তার। আমি তো এখন ডাক্তারী পড়ছি। অল্প দিনেই পাস করে বেরোবো।

অল্প দিন পরেই?

হ্যাঁ, অল্প দিন পরেই। অনেকদিন ধরেই তো পড়ছি, পাস করে ডাক্তার হতে আর কি বেশি দিন লাগবে?

ও বুঝেছি, বুঝেছি। পরে পাস করবেন। তা হুমাপতী, না এলাপতী? কি পাস করবেন?

হোমিওপ্যাথিক! বুঝলে হোমিওপ্যাথিক। ডাক্তারের বাবা ডাক্তার হ্যানিম্যান সাহেবের চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করছি। কোন হবুল্লা-ছবুল্লার চিকিৎসাবিদ্যা নয়।

কি কইলেন? মানুষ বাদ দিয়া হনুমানের চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে গেছেন ক্যান্?

দূর মূর্খ! হনুমান নয়, হনুমান নয়, হ্যানিম্যান। চিকিৎসাবিদ্যার আদি পিতা হ্যানিম্যান। আমি তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা শিখছি। একদম ডাকসাইটে চিকিৎসাবিদ্যা।

জামাল মিয়া অনেকটা অবজ্ঞা ভরে প্রশ্ন করলো, শিখতাছেন? পাস করেননি? তাহলে তো কোন পাসই নাই আপনার! আপনি হুদু হুদুই এক ভদ্দরলোক।

আবার সম্মানে লাগলো মানিক বাবুর। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, নাই মানে? আমি ম্যাট্রিকুলেট! আমি একজন ম্যাট্রিক পাস লোক। একজন পাকাপোক্ত ম্যাট্রিকুলেট।

ও, আচ্ছা, আপনি তাহলে ম্যাট্রিক পাস লোক? হেইডা মন্দ না। ম্যাট্রিক পাস অইলে তো ভদ্দরলোক হওনই যায়।

তবে? আমি একজন পাকাপোক্ত ম্যাট্রিকুলেট। যেমন তেমন নয়?

তাই নাকি? পাকাপোক্ত? তা অনেকদিন ধইরা পাইক্কা বুঝি ম্যাট্রিক পাস কইরাছেন।

সেটা তুমি ঠিক বলেছো। অন্যের মতো তড়াক করে পাস করে বেরিয়ে এলাম, এমন কাঁচা কিসিমের ম্যাট্রিকুলেট আমি নই। একটানা কয়েক বছর পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তবে ম্যাট্রিক পাস করেছি।

তয় তো ঠিকই আপনি পাকা মানে ঝুনা ম্যাট্রিক পাস লোক। একদম ঝুনা নারকেলের মতো। তা কইছিলাম কি, ম্যাট্রিক পাস মানুষ অইয়া আপনি আবার হনুমান, তওবা হোমিওপক্ষী পড়তে গেলেন ক্যান্? চাকুরী-বাকুরী করবেন?

মানিক বাবু এবার মলিন কণ্ঠে বললেন, এখানেই তো হয়েছে বড় মুস্কিল, বুঝলে? একদিকে আমার বাপতো আমাকে কোন চাকুরী-বাকুরী

করতেই দেবে না, অন্যদিকে এদেশে খাঁটি জিনিসের, মানে খাঁটি বিদ্যার কদর সবাই বোঝে না। চাকুরীর জন্যে কয়েক বছর সমানে ছুটে বেড়ালাম, কিন্তু কত কাঁচা ম্যাট্রিকুলেটের দরাদ্দর চাকুরী হয়ে গেল, অথচ আমার মতো ঝুনো ম্যাট্রিকুলেটের চাকুরী হলো না। তাই বাধ্য হয়ে এই হোমিওপ্যাথিতে চলে এলাম।

জিহ্বা আর তালুর সাহায্যে বিচিত্র শব্দ তুলে জামাল মিয়া আফসোসের সাথে বললো, আহারে! বড়ই দুঃখ! তয় ঐ হোমিওপক্ষী পড়লেই কি চাকুরী অইবো আপনার?

চাঙ্গা হয়ে উঠে মানিক বাবু বললেন, না, চাকুরী হবে কেন? ঐ ফালতু কাজটা করবো না বলেই তো এই ডাক্তারী পড়া। এ ছাড়া তো বললাম, আমার বাপ আমাকে কিছুতেই চাকুরী করতে দেবেন না!

ক্যান্, ক্যান্?

কারবার করার জন্যে। মস্ত বড় ইটের কারবার আছে আমার আব্বার। আব্বা চান আমি ঐ ইটের কারবার করি। তাই স্থির করেছি, ঐ ইটের ভাটার পাশে ডিস্পেন্সারী খুলে ডাক্তারী করবো আর ইট পোড়াবো। চাকুরী করে কয় পয়সা পাওয়া যায়, বলো, অথচ ইটের কারবারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ইনকাম।

খাইছেরে! ইটের ভাটায় বইসা ডাক্তারী করবেন?

করবেন মানে কি! করতে তো শুরু করেই দিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই বলতে লাগলো, পাস না থাকলে ডাক্তারী তেমন জমে না। ডাক্তারীটা পাস করে আসুন। তাদের কথাতেই তো এই হোমিও কলেজে ভর্তি হওয়া।

ও আচ্ছা। তয় ভালো, তয় ভালো।

এক পাশে দাঁড়িয়ে সালাউদ্দীন এতক্ষণ এই দুই বেকুফের বেয়াকুফী উপভোগ করছিলো। এই সময় কদম আলী এসে দেউটি থেকে ডাক দিলো, মাস্টার সাহেব! ও মাস্টার সাহেব, জলদি জলদি এদিকে আসুন, আপনার মেম সাহেব আপনাকে জব্বোর তালাশ করছেন।

জবাবে সালাউদ্দীন সাগ্রহে বললো, ও আচ্ছা, আসছি...!

সালাউদ্দীন সেখান থেকে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। মানিক বাবু সবিস্ময়ে জামাল মিয়াকে প্রশ্ন করলেন, মেম সাহেব! সে আবার কি? মেম সাহেব মানে?

জামাল মিয়া বললো, মেম সাহেব মানে জহুরা আম্মা। জহুরা আম্মাকেই তো মেম সাহেব বলেন এই মাস্টার সাহেব।

আচ্ছা। তা মাস্টারটা আবার কে?

ঐ সালাউদ্দীন সাহেব। যারে আপনি পা থেকে জুতা খুলে নিতে বললেন, হেই সালাউদ্দীন সাহেবই মাস্টার সাহেব। ঐ মাস্টার সাহেবরে আমার আম্মাজান জিয়াদা দরদ করেন তো, তাই হগ্‌গল হুমায় খোঁজ-খবর করেন তার।

ঐ লোকটা মাস্টার?

তয় আর বলছি কি? আমার আম্মাজানের বড় পেয়ারের মাস্টার।

নাও ঠ্যালা। তোমার আম্মাজানের কি রকম? তোমার আম্মাজান কে?

এই দেহ, হেডার খবর অহনও পাওনি? আম্মাজান মানে জহুরা জেসমিন। আমি যে জহুরা জেসমিনের চাচা!

আকস্মাৎ চমকে উঠে মানিক বাবু বললেন, এ্যাঁ! সেকি,.চাচা? মানে তুমি, মানে আপনি মীর সাহেবের ভাই?

তয় আর বলছি কি? মীর সাহেবের ভাইতো জরুর।

মানিক বাবু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, গলতি হয়ে গেছে, জব্বোর গলতি হয়ে গেছে! চিনতে না পেরে আমি বড়ই বেআদবী করে ফেলেছি। আপনি তো তাহলে সম্পর্কে আমার মুরুব্বী, অথচ আপনাকে আমি কদর দিতে পারিনে। আসসালামু আলায়কুম চাচাজান হবেন। জহুরা জেসমিনের সাথে আমার শাদিটা হয়ে গেলেই আপনিও আমার চাচাজান হয়ে যাবেন।

জামাল মিয়া হতভম্ভ কণ্ঠে বললো, হাদী! ডুবাইছেরে! জহুরা আম্মারে আপনি হাদী করতে আইছেন?

জি চাচাজান, জি। এক্কেবারে আসল কথাটা ধরে ফেলেছেন! সেজন্যেই তো আমার এখানে আসা, নইলে কত কাজ আমার! আমি কি স্রেফ বেরেণ্ডা ভাজার জন্যে এখানে এসেছি?

কইছেন কি!

জি, হক কথা কইছি। বিনা মতলবে এই শর্মা এক কদম কোথাও যায় না।

হাসতে লাগলেন আর হাসির তালে তালে দুলতে লাগলেন মমতাজ উদ্দীন মানিক ওরফে মানিক বাবু।

বইঘর.কম ও রোকন

এই সময় খোদ মীর সাহেবের তলব আসায় জামাল মিয়াকেও দ্রুত পদে ছুটতে হলো অন্দরের দিকে। সে এসে অন্দরে ঢুকতেই মীর সাহেব তাকে ডাক দিয়ে বললেন, এদিকে এসো, কথা আছে।

জামাল মিয়া মীর সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালে মীর সাহেব বললেন, কদম আলীর মুখে শুনলাম, তুমি নাকি আমাদের মেহমান মমতাজ উদ্দীন বাবাজীর সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছো?

জামাল মিয়া থতমত করে বললো, তর্ক? কই নাতো!

মীর সাহেব তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, খবরদার! তার সাথে কোন বেআদবী করবে না। তোমার তো হুঁশ-বুদ্ধি খুব কম। কখন কি বলে বসো, তার ঠিক কি!

ভাইজান!

ঐ মমতাজ উদ্দীন বাবাজী আমাদের হবু জামাই। জহুরা জেসমিন আম্মাকে তার সাথে শাদি দেবো বলেই তাকে দাওয়াত করে এ বাড়িতে এনেছি।

ফের চমকে গেল জামাল মিয়া। দুই চোখ বিস্ফারিত করে সে প্রশ্ন করলো, জহুরা জেসমিন আম্মার ছাদি দেবেন, মানে এই মেহমানের সাথে?

মীর আফসার উদ্দীন সাহেব কিছুটা উদাস কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, দিতে তো হবেই। জহুরার বয়সটা কত হলো তা কি তুমি জানো? আমি সেটা জানি। আর কত দিন তাকে ধরে রাখবো বাড়িতে।

কিন্তুক তাই বলে এই লোকের সাথে?

কেন, এই লোকটার দোষ কি? চেহারাটা আমাদের মাস্টার সাহেবের মতো জৌলুসদার নয় বলে?

জি ভাইজান। জৌলুসদার না হউক, মোটামুটি দর্শনধারী হওন লাগবো তো? গায়ের রংটা না হয় একটু ফর্সাই আছে, কিন্তু মুখের কাটিং? কেমন যেন বানরমুখো মানুষ আর কাকলাশ মার্কা চেহারা। মুখের কাটিংটা বিলকুল বানরের মুখের মতোই। জহুরা আম্মার সাথে কি এই লোককে আদৌ মানায়? আম্মাজানের বরের চেহারাটা হবে...!

মীর সাহেব রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, আরে রাখো তোমার চেহারা। পুরুষ মানুষের আবার চেহারার হিসাব কি? জানো, ঐ মমতাজ উদ্দীন বাবাজী

কোন্ ঘরের ছেলে আর কেমন তার বাপের বিষয়বিত্ত? টাকার কুমীর! বাপটা তার অঢেল টাকার মালিক। বিশাল তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স আর বিরাট কায়-কারবার! এই একটামাত্র ছেলে। সবই তাঁর এই ছেলে মমতাজ উদ্দীন পাবে, মানে আমার মেয়ে-জামাই পাবে।

ভাইজান!

ওখানে বিয়ে হলে জহুরা আম্মা আমার সোনার থালায় খাবে আর সোনার খাটে শুয়ে থাকবে। বরের চেহারাটা এখানে তেমন কোন হিসাবের মধ্যে আসে কি?

তয় মানান বলে তো একটা কথা আছে ভাইজান?

আরে ফেলে দাও তোমার মানান। আমাদের এই মাস্টার সালাউদ্দীনের চেহারা তো রাজপুত্রের মতো! জহুরা আম্মার সাথে তাকে মানাবে চমৎকার। কিন্তু ঐ মানান দিয়ে হবেটা কি? সালাউদ্দীনের কি সাধ্য আছে আমার জহুরা আম্মাকে স্রেফ মোটা ভাত আর মোটা কাপড়টা দেয়ার? বলো, আছে সাধ্য?

জামাল মিয়া আম্‌তা আম্‌তা করে বললো, তা মানে...!

তার কথায় কান না দিয়ে মীর সাহেব ফের জোরালো কণ্ঠে বললেন, চাল নেই, চুলো নেই, বিষয়বিত্ত কিছুই নেই। এমন বরের চেহারার কি দাম আছে বাজারে? অথচ তেমন দর্শনধারী না হলেও আমাদের এই মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীকে নিয়ে সে কী কাড়াকাড়ি সবার মধ্যে! বলতে পারো, তাকে আমি একদম কেড়েই এনেছি আমার জহুরা আম্মার জন্যে।

জামাল মিয়া ম্লান কণ্ঠে বললো, কেড়ে এনেছেন?

মীর সাহেব সরবে বললেন, হ্যাঁ, কেড়েই এনেছি। অন্যেরা ধরে নেয়ার আগেই ধরে ফেলেছি আমি। বরের দাম রূপ দিয়ে হয় না, বুঝলে? হয় ধন-সম্পদ দিয়ে। আগাধ ধন-সম্পদের ভবিষ্যৎ মালিক এই বর।

জামাল মিয়া স্তম্ভিত কণ্ঠে বললো, ভাইজান!

মীর সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন, তোমাকে যা বললাম, সেই দিকে হুঁশ রাখবে। মানে তোমাকে দিয়ে কিছুতেই যেন কোন অসম্মান না হয় আমার হবু জামাইয়ের।

বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলো জামাল মিয়া। মীর সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, হাঁ করে চেয়ে রইলে কেন? যাও, নিজের কাজে যাও...!

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে জামাল মিয়া স্বগতোক্তি করলো, কপাল, সবই কপাল!

এরপর সে নতমস্তকে সরে গেল সেখান থেকে।

বাতের রোগী জহুরা জেসমিনের আম্মাজানও কম গেলেন না এ ব্যাপারে। সেদিন দুপুর বেলা জহুরা জেসমিন আর সালাউদ্দীন কী এক সরস আলাপ নিয়ে হাসাহাসি করছিল। আলাপটা হচ্ছিল জহুরা জেসমিনের শয়ন কক্ষে। তার পাশের কক্ষেই শুয়ে ছিলেন জহুরা জেসমিনের আম্মাজান। হাসির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে গেলে লাঠিতে ভর দিয়ে জহুরা জেসমিনের কক্ষের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দুয়ার থেকেই কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কি হয়েছেরে জহুরা? এত হাসাহাসি কিসের?

আম্মাজানের এই আকস্মিক আগমনে অপ্রতিভ হলো জহুরা জেসমিন ও সালাউদ্দীন দুজনই। বন্ধ হলো আলাপ তাদের। বন্ধ হলো হাসি। আম্মার প্রশ্নের জবাবে জহুরা জেসমিন থতমত করে বললো, না মানে, বাজারে আজ এক মজার ঘটনা ঘটেছে কিনা, তাই...!

ঐ একই রকম রাগত স্বরে আম্মাজান বললেন, তা সে মজার ঘটনা তোর ঘরের মধ্যে কেন? এটাও কি বাজার?

পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বাজারের একটা থলে হাতে সালাউদ্দীন তখনই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বক্র নয়নে তার গমন পথের দিকে চেয়ে থেকে আম্মাজান সক্রোধে স্বগতোক্তি করলেন, আস্কারা পেয়ে পেয়ে আপদটা ক্রমেই মাথায় উঠতে শুরু করেছে দেখছি!

কিছুটা দূরে চলে গেলেও উক্তিটা সালাউদ্দীনের কানে গেল। চকিতে একবার পেছন ফিরে চেয়ে সে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে অতি দ্রুত চলে গেল বাহির আঙিনার দিকে।

জহুরা জেসমিনের নজর সেটা এড়ালো না। এবার রাগ হলো তারও। আম্মাকে সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কি বললেন, আম্মাজান? কাকে বললেন কথাটা?

আম্মাজান দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, যাকে বলার দরকার, তাকেই বলেছি। ছি, ছি, ছি...!

আম্মাজান!

হায়া-লজ্জা সব কি বেচে খেয়েছো তুমি? ঐ একটা বাজার-সরকারকে নিজের শয়নকক্ষে ডেকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা জুড়ে দিয়েছো কোন্ জ্ঞানে?

জহুরা জেসমিনের রাগ আরো বেড়ে গেল। সে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, রঙ-তামাসা! কিসের রঙ-তামাসা?

আম্মাজানও কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, এই হাসাহাসি আর মাতামাতি। কিসের তা বুঝতে পারছো না? ছি, ছি, ছি! বাড়ি ভরা মানুষ, আর একটা কর্মচারীকে ঘরে নিয়ে এই রকম বেহায়াপনা? এটা দেখে সবাই ভাববে কি? এ কথাটাও মনে এলো না তোমার?

কেন, আমার কর্মচারীর সাথে আমি কথা বলবো, হাসির ব্যাপার হলে হাসবো, তাতে কে কি ভাববে আর আমি সেটা দেখতে যাবো কেন?

যাবে না কেন? এখনোও কি তুমি কচি খুকীটিই আছো? বয়সটা যে তোমার তালগাছকে ছাড়িয়ে গেল, সেদিকে হুঁশ নেই? এই বয়সে একজন তাগ্ড়া জোয়ান পর পুরুষকে ঘরে নিয়ে তুমি মাতামাতি করবে আর এটা দেখে বাড়ির ঝি-চাকরেরা কেউ কিছুই ভাববে না আর কুৎসা রটাবে না, এটা মনে করো?

www.boighar.com

না, রটাবে না। রটালে আপনিই রটাবেন। তারা কেউ রটাবে না।

রটাবে না?

না। কারণ বাড়ির-ঝি চাকরেরা সবাই জানে এর মধ্যে কোন কলুষ বা ক্লেদ নেই। তারা জানে, আমার কর্মচারীর সাথে আমি কথা বলবো, তাকে পরিচালনা করবো, সেজন্যেই আমি কর্মচারী নিয়োগ করেছি। কর্মচারীকে দেখে ঘোমটা দিয়ে ঘরের কোণে লুকাবো, সেজন্যে কর্মচারী নিয়োগ করিনি।

বেশ, তারা না হয় সেটা জানলো, কিন্তু ঐ ছেলেটা? আমাদের মমতাজউদ্দীন মানিক বাবাজীর চোখে যদি পড়ে যায় এটা?

কোন্টা?

ঐ কর্মচারীর সাথে তোমার ঐ অবাধ মেলামেশা আর হাসাহাসি?

তাতে কি হবে?

সে রুষ্ট হবে না? নাখোশ-নারাজ হবে না? রাগ হবে না তার?

তাতে আমার কি?

তোমার নয় তো কার? আজ বাদে কাল ঘর করতে হবে তোমাকে যার সাথে, সে নারাজ-নাখোশ হলে ক্ষতিটা হবে কার?

কি বললে? ঘর করতে হবে নাকি? কার সাথে?

ন্যাকা! কার সাথে তা কি জানো না? এই যে এত সাধাসাধি করে মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীকে ডেকে এনেছেন তোমার আব্বাজান, সেটা কিসের জন্যে? তোমার সাথে শাদি দেয়ার জন্যেই নয় কি?

আমার শাদি দেবে? ঐ লোকটার সাথে?

কেন, ঐ লোকটা খারাপ হলো কিসে? কোটিপতি মানুষের ম্যাট্রিক পাস ছেলে। এমন ছেলের সাথে তোমার আব্বা তোমার শাদি দেবেন নাতো দেবেন কার সাথে? কোন্ এক হাভাতে, অর্ধশিক্ষিত আর বেকার ছেলের সাথে?

তা যার সাথেই দিন, শাদি এখন করছে কে?

সামনে আমার পরীক্ষা। পরীক্ষা দেয়ার আগে শাদির কোন কথার মধ্যেই আমি নেই। ও ভাবনা আপনারাই ভাবুনগে।

ভাবতে তো হবেই। বাপ-মায়ে ভাববে না তো ভাববে কি পড়শী-পাড়ার লোক? পরীক্ষা দেবে দাও। কিন্তু এই বরকে হাতছাড়া করা যাবে না, সেটা খেয়াল রেখো।

বিরক্ত হলো জহুরা জেসমিন। সে এবার পরিহাস্যচ্ছলে বললো, ঠিক আছে। রাখতে বলছেন, রাখবো।

মেয়ের এই কথাতেই অনেকটা আশ্বস্ত হলেন আম্মাজান। মেয়েকে সমঝানোর চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় মেয়ের এই পরিহাসের সুর কানে তাঁর আদৌ বাজলো না। উৎসাহিত হয়ে উঠে তিনি ফের বললেন, শুধু খেয়াল রাখলেই হবে না মা, সালাউদ্দীনের সাথে তোমার এই মাতামাতি যেন মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীর চোখে না পড়ে, বিশেষ করে তার সামনে এ রকম মাতামাতি করবে না।

মায়ের এই অতি আগ্রহে অর্থাৎ পাগলামীতে জহুরা জেসমিন স্বাভাবিকভাবেই আরো অধিক পুলকিত হয়ে উঠলো। তাই সে পরিহাসের জের টেনে বললো, আচ্ছা, করবো না।

মানিক বাবাজীর সাথে কোন অভদ্র আচরণ করবে না। সে তোমার হবু বরই নয় শুধু, সে এক কোটিপতির একমাত্র আর মানী-গুণী ছেলে। তার সাথে সব সময় ভদ্র আচরণ করবে।

বইঘর.কম ও রোকন

করবো।

কোনভাবে যদি মানিক বাবাজীকে ক্ষুব্ধ বা নাখোশ করো, তাহলে কিন্তু তোমার আব্বাজান বেজায় গোস্বা হবেন তোমার ওপর। তোমার আচরণে মানিক বাবাজী যদি রাগ করে চলে যায় আমাদের বাড়ি থেকে তাহলে কিন্তু তোমার আব্বাজান শয্যা নেবেন শোকে-দুঃখে —এ কথাটা স্মরণ রাখবে সব সময়। অবশ্য অবশ্যই স্মরণ রাখবে।

নির্ঘাত এমনটি যে ঘটতেই পারে, শুধু তার আব্বাজানই নয়, মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবু রাগ করে চলে গেলে তার আম্মাজানও যে শয্যা নেবেন... সেটা মানিক বাবুর প্রতি এঁদের খাতির যত্নের বহর দেখে জহুরা জেসমিন আগেই বুঝে নিয়েছে। তাই আর পরিহাস করে নয়, জহুরা জেসমিন এবার সতর্ক কণ্ঠেই বললো, না না, আব্বাজান শয্যাশায়ী হবেন, এমন কাজ কখনো আমি করবো না।

মমতাজ উদ্দীন মানিক মিয়ার প্রতি পিতা-মাতার সেবাযত্নের সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য দেখে জহুরা জেসমিন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তার আচরণে নাখোশ হয়ে এ লোকটি মানে এই মমতাজ উদ্দীন মানিক এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে স্রেফ শয্যা নেয়াই নয়, নির্ঘাত হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার পিতা-মাতা দুজনই ইহধাম ত্যাগ করবেন। গৃহে এই অবশ্যম্ভাবী অঘটন এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই জহুরা জেসমিন মানিক বাবুর সাথে কোন দুর্ব্যবহার না করে অনেকটা মিল দিয়েই চলতে লাগলো· অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলো মানিক বাবুর সাথে, ওঠাবসাও করতে লাগলো বাড়ির আর পাঁচজনের সাথে ওঠাবসা করার মতো করেই। কোন রকম মাখামাখি করতে না গেলেও দৃষ্টিকটু হয় তার সাথে মেলামেশার মধ্যে এমন কোন দূরত্ব বা ব্যবধান সে সৃষ্টি করতে গেল না। কলেজে চলে গেলেই এ নাটকের আপসে আপ পরিসমাপ্তি ঘটবে, এটা ভেবেই জহুরা জেসমিন এই পথ বেছে নিলো।

মেয়ের এ আচরণ দেখে নিশ্চিন্ত হলেন জহুরা জেসমিনের পিতামাতা দুজনই। তাঁরা হৃষ্টচিত্তে ধরে নিলেন, জহুরা জেসমিনের অবশেষে দিব্যদৃষ্টি খুলেছে। মানিক বাবুর মতো এমন কোটিপতির ছেলেকে

তোমার নয় তো কার? আজ বাদে কাল ঘর করতে হবে তোমাকে যার সাথে, সে নারাজ-নাখোশ হলে ক্ষতিটা হবে কার?

কি বললে? ঘর করতে হবে নাকি? কার সাথে?

ন্যাকা! কার সাথে তা কি জানো না? এই যে এত সাধাসাধি করে মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীকে ডেকে এনেছেন তোমার আব্বাজান, সেটা কিসের জন্যে? তোমার সাথে শাদি দেয়ার জন্যেই নয় কি?

আমার শাদি দেবে? ঐ লোকটার সাথে?

কেন, ঐ লোকটা খারাপ হলো কিসে? কোটিপতি মানুষের ম্যাট্রিক পাস ছেলে। এমন ছেলের সাথে তোমার আব্বা তোমার শাদি দেবেন নাতো দেবেন কার সাথে? কোন্ এক হাভাতে, অর্ধশিক্ষিত আর বেকার ছেলের সাথে?

তা যার সাথেই দিন, শাদি এখন করছে কে?

সামনে আমার পরীক্ষা। পরীক্ষা দেয়ার আগে শাদির কোন কথার মধ্যেই আমি নেই। ও ভাবনা আপনারাই ভাবুনগে।

ভাবতে তো হবেই। বাপ-মায়ে ভাববে না তো ভাববে কি পড়শী-পাড়ার লোক? পরীক্ষা দেবে দাও। কিন্তু এই বরকে হাতছাড়া করা যাবে না, সেটা খেয়াল রেখো।

বিরক্ত হলো জহুরা জেসমিন। সে এবার পরিহাসচ্ছলে বললো, ঠিক আছে। রাখতে বলছেন, রাখবো।

মেয়ের এই কথাতেই অনেকটা আশ্বস্ত হলেন আম্মাজান। মেয়েকে সমঝানোর চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় মেয়ের এই পরিহাসের সুর কানে তাঁর আদৌ বাজলো না। উৎসাহিত হয়ে উঠে তিনি ফের বললেন, শুধু খেয়াল রাখলেই হবে না মা, সালাউদ্দীনের সাথে তোমার এই মাতামাতি যেন মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীর চোখে না পড়ে, বিশেষ করে তার সামনে এ রকম মাতামাতি করবে না।

মায়ের এই অতি আগ্রহে অর্থাৎ পাগলামীতে জহুরা জেসমিন স্বাভাবিকভাবেই আরো অধিক পুলকিত হয়ে উঠলো। তাই সে পরিহাসের জের টেনে বললো, আচ্ছা, করবো না।

মানিক বাবাজীর সাথে কোন অভদ্র আচরণ করবে না। সে তোমার হবু বরই নয় শুধু, সে এক কোটিপতির একমাত্র আর মানী-গুণী ছেলে। তার সাথে সব সময় ভদ্র আচরণ করবে।

করবো।

কোনভাবে যদি মানিক বাবাজীকে ক্ষুব্ধ বা নাখোশ করো, তাহলে কিন্তু তোমার আব্বাজান বেজায় গোস্বা হবেন তোমার ওপর। তোমার আচরণে মানিক বাবাজী যদি রাগ করে চলে যায় আমাদের বাড়ি থেকে তাহলে কিন্তু তোমার আব্বাজান শয্যা নেবেন শোকে-দুঃখে —এ কথাটা স্মরণ রাখবে সব সময়। অবশ্য অবশ্যই স্মরণ রাখবে।

নির্ঘাত এমনটি যে ঘটতেই পারে, শুধু তার আব্বাজানই নয়, মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবু রাগ করে চলে গেলে তার আম্মাজানও যে শয্যা নেবেন... সেটা মানিক বাবুর প্রতি এঁদের খাতির যত্নের বহর দেখে জহুরা জেসমিন আগেই বুঝে নিয়েছে। তাই আর পরিহাস করে নয়, জহুরা জেসমিন এবার সতর্ক কণ্ঠেই বললো, না না, আব্বাজান শয্যাশায়ী হবেন, এমন কাজ কখনো আমি করবো না।

মমতাজ উদ্দীন মানিক মিয়ার প্রতি পিতা-মাতার সেবাযত্নের সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য দেখে জহুরা জেসমিন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তার আচরণে নাখোশ হয়ে এ লোকটি মানে এই মমতাজ উদ্দীন মানিক এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে স্রেফ শয্যা নেয়াই নয়, নির্ঘাত হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার পিতা-মাতা দুজনই ইহধাম ত্যাগ করবেন। গৃহে এই অবশ্যম্ভাবী অঘটন এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই জহুরা জেসমিন মানিক বাবুর সাথে কোন দুর্ব্যবহার না করে অনেকটা মিল দিয়েই চলতে লাগলো· অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলো মানিক বাবুর সাথে, ওঠাবসাও করতে লাগলো বাড়ির আর পাঁচজনের সাথে ওঠাবসা করার মতো করেই। কোন রকম মাখামাখি করতে না গেলেও দৃষ্টিকটু হয় তার সাথে মেলামেশার মধ্যে এমন কোন দূরত্ব বা ব্যবধান সে সৃষ্টি করতে গেল না। কলেজে চলে গেলেই এ নাটকের আপসে আপ পরিসমাপ্তি ঘটবে, এটা ভেবেই জহুরা জেসমিন এই পথ বেছে নিলো।

মেয়ের এ আচরণ দেখে নিশ্চিন্ত হলেন জহুরা জেসমিনের পিতামাতা দুজনই। তাঁরা হৃষ্টচিত্তে ধরে নিলেন, জহুরা জেসমিনের অবশেষে দিব্যদৃষ্টি খুলেছে। মানিক বাবুর মতো এমন কোটিপতির ছেলেকে

বইঘর.কম ও রোকন

হাতছাড়া করাটা যে নিদারুণ মূর্খতা, এটা অবশেষে বুঝতে পেরেছে জহুরা। বুঝতে পেরেছে, জীবনের সুখ-শান্তির জন্যে চেহারাটাই বড় নয়, অর্থটাই বড়। মমতাজ উদ্দীন মানিককে বিয়ে করতে তার যে আর কোন আপত্তি নেই, মমতাজ উদ্দীন মানিকের সাথে তার এই স্বচ্ছন্দ মেলামেশা দেখেই তাঁদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। www.boighar.com

মেলামেশাটা খুবই স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় মানিক বাবু আর জহুরা জেসমিনের মধ্যে আর কোন সংকোচ বা জড়তা রইলো না। ওদিকে আবার সালাউদ্দীন একজন গৃহশিক্ষক। আফাজ-হাফিজের মাস্টার। সবাই তাকে মাস্টার সাহেব বলে সম্বোধন করে। এতে করে মানিক বাবু তাকে যতটা হেনস্তা করতে চেয়েছিলেন ততটা সুযোগ আর তার রইলো না। কারণ সালাউদ্দীনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে দেখলে চাকর-নফরসহ এ বাড়ির অনেকেই নাখোশ হয়, বিশেষ করে জহুরা জেসমিন নাখোশ হয় সবার চেয়ে অধিক। এ ব্যাপারে সে মানিক বাবুকে কড়া হুঁশিয়ারী দিয়েছে একাধিকবার। এর ফলে মানিকবাবু এখন খামোশ হয়ে গেছে।

মানিক বাবুর লক্ষ সব সময়ই স্থির। জহুরা জেসমিনের না-পছন্দ কোন কাজ কখনোই করতে পারেন না তিনি। কারণ সুস্পষ্ট, জহুরা জেসমিন বেঁকে বসলে তার পরিকল্পনাটা গোটাই বানচাল হয়ে যাবে। জহুরা জেসমিনের রূপটা হাত ছাড়া হলে তেমন দুঃখ নেই, কিন্তু জহুরা জেসমিনের বাপের রূপাগুলো হাত ছাড়া হলে আকাশ ভেঙে পড়বে তার মাথায়। হাতের মধ্যে পাওয়া ধন হারাতে তিনি রাজী নন কখনো। তাই, সালাউদ্দীনের সাথে মেলামেশাটা তিনিও এখন সহজ করে ফেলেছেন। মুনিব আর কর্মচারীর মধ্যে যে দূরত্বটা থাকে, সেটা বজায় রেখে মানিক বাবু এখন সালাউদ্দীনের সাথে সহজভাবে মেশেন। সময় সময় গল্প, আলাপ আর হাসি-ঠাট্টাও করেন।

এক বিকেলবেলা এমনই একটা গল্প, আলাপ আর হাসি-ঠাট্টার আসর বসেছিল জহুরাদের অন্দর মহলের আঙিনায়। চাপর্বকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল এই গল্প, আলাপ ও হাসি-মস্করা। আঙিনার মাঝখানে একটা টেবিল আর টেবিলের চারপাশে কয়েকখানা চেয়ার পেতে চা পানপর্ব চলছিল। টেবিলটাকে ঘিরে চেয়ারে বসেছিলেন মানিক বাবু, জহুরা জেসমিন ও জামাল মিয়া। চাকর কদম আলী চা-পানি সরবরাহ করছিল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল সালাউদ্দীন। জহুরা জেসমিন

তাকে চেয়ারে বসার জন্যে আহ্‌বান জানালেও সালাউদ্দীন সাড়া দেয়নি সে আহ্বানে।

রসালো এক প্রসঙ্গ নিয়ে তখন জমে উঠেছে হাসাহাসি। সে হাসিতে যোগ দিয়েছে চায়ের টেবিল ঘিরে উপস্থিত সকলেই। জামাল মিয়া হাসতে হাসতে এক সময় মানিক বাবুকে প্রশ্ন করলো, তা মানিক মিয়া, আমার একটা কথার জবাব দাও দেহি?

হাসি তখন তুঙ্গে। মানিক বাবু সেই হাসির মধ্যেই নিমজ্জিত ছিলেন বলে জামাল মিয়ার আহ্বানে কোন সাড়া-শব্দ করলেন না। ক্ষুব্ধ হলো জামাল মিয়া। কণ্ঠ এবার সপ্তমে তুলে দিয়ে বললো, আরে ও মানিক মিয়া? মানিক মিয়া? কতাডা আমার হুনতেই পাইলেন না নাকি?

রুষ্ট হলেন মানিক বাবু। হাসি থামিয়ে তিনি রাগত স্বরে বললেন, আরে কি মিয়া-মিয়া করছেন? আমার নামটাই এখনো রপ্ত করতে পারেননি? মাথায় কি কেবলই ষাঁড়ের গোবর?

জামাল মিয়া ঘাবড়ে গিয়ে বললো, জি?

মানিক বাবু বললেন, আমার নাম মানিক মিয়া নাকি?

তয়?

আমার নাম মমতাজউদ্দীন মানিক ওরফে মানিক বাবু। সবাই আমাকে মানিক বাবু বলে আর ঐ মানিক বাবু নামটাই আমার অধিক পছন্দ।

ও, আপনারে তাহলে মানিক বাবু বলতে অইবো? মানিক মিয়া নয়?

ফের মিয়া বলায় আবার জ্বলে উঠলেন মানিক বাবু। আবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, খবরদার! আমার নামের সাথে ঐ মিয়া-মৌলভী যোগ করবেন না কখনো। ওসব আমি একদম পছন্দ করিনে। এতবার বলছি আমার নাম মানিক বাবু। মানিক বাবু বলতে কি কষ্ট হয়?

জামাল মিয়া ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো, না, তা অইবো ক্যান্? তয় মুসলমান মানুষের নামের সাথে ঐ মিয়াটাই চলে কি না, বাবুটা চলে না। বাবু বললে কেমন যেন ভিনজাত, ভিনজাত মনে অয়।

কেমন মনে হয়, সে ব্যাখ্যা আমার দরকার নেই। আমাকে ডাকলে মানিক বাবু বলে ডাকবেন, ব্যস্!

তয় তাই-ই অইবো, আপনি যা চাইবেন তাই-ই অইবো। জহুরা জেসমিনের আব্বা ও আম্মা নিকটেই বারান্দায় বসে ছিলেন। এদের এই বাক-বিতণ্ডার মধ্যেই জহুরা জেসমিনের আব্বা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন

বইঘর.কম ও রোকন

বারান্দা থেকে। জহুরা জেসমিনের কাছে এসে তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, ওহো জহুরা, একটা কথা বলতে আমি ভুলেই গেছি। তোমাদের এখনই উঠতে হবে। চা খাওয়াটা শেষ করো তাড়াতাড়ি।

জহুরা জেসমিন মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, উঠতে হবে মানে?

আব্বা অর্থাৎ মীর সাহেব বললেন, তোমাদের এখনই ঐ ঠিকাপাড়া সোনারের বাড়িতে যেতে হবে। গতকালই যেতে হতো, কিন্তু আমি ভুলে যাওয়ায় তোমাকে বলা হয়নি সে কথা।

সোনারের বাড়িতে! কেন?

ওখানে তোমার কিছু গহনা গড়ানোর অর্ডার দিয়ে এসেছি। সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়ে কিছুটা পেমেন্টও করে এসেছি আমি। শুধু ডিজাইনটা ঠিক করে না দেয়ার জন্যে সোনার কারিগরেরা কাজটা শুরু করতে পারছে না।

ডিজাইন ঠিক করে দিতে হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি তা দিতে হবে। ঐ কারিগররা বড় ব্যস্ত মানুষ। অন্য কাজ ধরলে দেড়-দুই সপ্তাহেও আর আমাদের কাজে হাত দিতে পারবে না।

তাহলে কি করতে বলছেন?

তোমাদের এখনই ঐ ঠিকাপাড়ার সোনারের বাড়িতে যেতে হবে। গিয়ে ডিজাইন বইয়ে হরেক রকম ডিজাইন আছে, তা দেখে পছন্দ মতো অর্ডার দিয়ে এসো। যাও ওখানে।

ঐ ঠিকাপাড়ায়? তা ঠিকপাড়ায় কেন? আমাদের গাঁয়ের পশ্চিম পাড়াতেও তো সোনারের বাড়ি আছে। সেখানে না দিয়ে আপনি ঠিকাপাড়ায় অর্ডার দিয়ে এলেন কেন?

মীর সাহেব উৎসাহভরে বললেন, টিকাপাড়ার কারিগরেরা খুবই এক্সপার্ট কারিগর। বড় চমৎকার হাতের কাজ ওদের। তাই দূর-দূরান্তের মানুষ এসেও ওদের কাছ থেকে গহনা গড়িয়ে নিয়ে যায়। তা ছাড়া সৎ ব্যবসায়ী হিসাবেও বেশ সুনাম আছে ওদের। আমাদের ও পাড়ার স্বর্ণকারটা ততটা দক্ষ কারিগর নয়। খুব সুন্দর গহনা গড়ানোর তাদের তেমন অভিজ্ঞতা নেই। ওদিকে আবার তার সততা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এক রত্তি সোনা চুরি সে করবেই—একথা অনেকেই বলে।

তাই নাকি?

গহনাগুলো নিপুণ হাতে গড়ে নেয়ার জন্যেই ঐ ঠিকাপাড়ায় অর্ডার দিয়ে এসেছি। তুমি যাও, গিয়ে প্রতিটি সেটের ডিজাইনটা পছন্দ করে দিয়ে এসো। ওদের কাছে ডিজাইনের প্রচুর বই আছে।

তা কথা হলো...!

কথা হলো নয়। এখনই যাও, আর দেরী করা মোটেই ঠিক হবে না।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু আমার গহনা গড়ানোর হঠাৎ এত তাড়া পড়লো কি কারণে?

কারণ তো আছেই। শাদি দিতে হবে না তোমার? শাদির বয়সটা তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। এখন সুযোগ-সুবিধে মতো যে কোন দিন শাদিটা তোমার দিয়ে ফেলতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

যে কোন দিন শাদি দেবেন আমার?

দিতে তো হবেই। আর এ ছাড়া আমার অসুস্থ শরীর। বয়সও হয়েছে অনেক। আজ আছি কাল নেই। সময় থাকতে তোমার অলংকারাদি তৈরি করে রাখতে না পারলে পরে হয়তো আর সে সুযোগই পাবো না আমি।

এই সময় জহুরা জেসমিনের আম্মা জহুরা জেসমিনকে তাড়া দিয়ে বললেন, কী সব ফালতু কথায় সময় নষ্ট করছো? বাপের মতো তুমিও বেখেয়াল হয়ে গেলে নাকি? বেলাটা তো শেষ হয়ে গেল। প্রায় দেড়-মাইল পথ! ফিরে আসতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। যাও শিগ্গির।

জবাবে জহুরা জেসমিন বললো, জি আম্মাজান, যাচ্ছি। জামাল চাচাকে সাথে নিয়ে এখনই যাচ্ছি।

আম্মাজান তিরিক্কি হয়ে উঠলেন আর তিরিক্কি কণ্ঠে বললেন, জামাল চাচা কেন? ও গহনার ডিজাইনের কি বোঝে? যে বোঝে, তাকে সাথে নিয়ে যাও।

আম্মাজান!

আমাদের মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীকে সংগে করে নিয়ে যাও। বিরাট ধনী লোকের ছেলে। ওরকম বিশ-পঞ্চাশ সেট্ গহনা বাড়িতে আছে ওদের। তাকে সাথে নিয়ে দুজনে মিলে ডিজাইনটা পছন্দ করে দিয়ে এসো।

নিজের নাম উঠতেই মানিক বাবু উৎসাহ ভরে বললেন, জি, আমাকে যেতে বলছেন?

জহুরার আম্মাজান খোলা কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, বাপজান, তোমাকেই। আসলে পছন্দটা তো তোমারই করে দেয়া উচিত হবে। তাহলে ডিজাইন নিয়ে পরে আর তোমার কোন মনঃকষ্ট থাকবে না।

আম্মাজানের এই ইংগিতটা উপস্থিত কারো কাছেই তেমন অস্পষ্ট রইলো না। ইংগিতটা বুঝতে পেরেই উল্লাসে নেচে উঠলেন মানিক বাবু। বললেন, জি, চাচীজান, জি জি। আপনি ঠিক বলেছেন। একদম কায়েমী কথা বলেছেন। আমিই সাথে যাবো তাঁর। আমি থাকতে উনি যার তার সাথে যাবেন কেন?

জহুরা জেসমিনের আব্বাজান অর্থাৎ মীর সাহেব এর সাথে যোগ দিয়ে বললেন, যাও, বাপজান, জহুরা আম্মার সাথে তুমিই যাও। আমাকে এখনই একটু বাইরে যেতে হচ্ছে! নইলে আমিও তোমাদের সাথে যেতাম। মাইল দেড়েক দূরে হলেও নদীর পাড় বেয়ে বড় মনোরম পথ।

মানিক বাবু একই রকম উল্লাসভরে বললেন, জি, তাই নাকি?

হ্যাঁ, বাপজান। ফুরফুরে নদীর হাওয়া। সান্ধ্য ভ্রমণের পুরো আমেজটা পাবে এখন রওনা হলে। যাও, আর দেরী করলে ফিরতে বেশ রাত হবে।

মানিক বাবু ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, না, মোটেই দেরী করবো না। ঘরে গিয়ে এখনই আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আর রাত যদি খানিকটা হয়ও তাহলেও কারো কোন রকম উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কারণ আমি তো সাথেই থাকবো আপনাদের মেয়ের।

বলেই মানিক বাবু হৃষ্টচিত্তে তার ঘরের দিকে ছুটলো। চাপর্ব শেষ হওয়ায় সালাউদ্দীন ও জামাল মিয়া বেরিয়ে এলো বাহির বাড়িতে। ইংগিতে কদম আলীকে ডেকে নিয়ে জহুরা জেসমিন গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকলো। বাতের রোগী আম্মাজান খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা হলেন তার নিজের ঘরের দিকে। জহুরার আব্বাজানও লাঠিতে ভর দিয়ে তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেন তখনই।

নিজ কক্ষে এসে জহুরা জেসমিন কদম আলীকে বললো, এখনই গিয়ে মাস্টার সাহেবকে রেডি হতে বলো। আর রেডি হয়ে ঐ পেছনের আঙিনায় এসে অপেক্ষা করতে বলো। আমার সাথে তাকে ঠিকাপাড়ায় যেতে হবে।

কদম আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো, এ্যাঁ, ঠিকাপাড়ায়?

জহুরা জেসমিন বললো, হ্যাঁ, ঠিকাপাড়ায় ঐ সোনারের বাড়িতে।

বইঘর.কম ও রোকন

চমকে গেল কদম আলী। বললো, ওরে বাপরে! সেকি, তাহলে যে মানিক বাবু বেজায় রাগ করবেন। আপনার সাথে তো মানিক বাবুর যাওয়ার কথা। মানিক বাবুকে ফেলে মাস্টার সাহেবকে সংগে নিয়ে গেলে মানিক বাবুতো মানিক বাবু, আপনার আব্বা-আম্মাও রেগে একদম আগুন হয়ে যাবেন!

হোক, যে যা হয় হোক। তোমাকে যা করতে বললাম, তাই করো।

করবো তো, কিন্তু মাস্টার সাহেবও কি রাজী হবেন এ কাজে? আপনার আব্বা-আম্মা দুজনই যে খুব জোর দিয়ে মানিক বাবুকে আপনার সাথে যেতে বললেন, সে কথা তো মাস্টার সাহেব নিজের কানে শুনেছেন। এরপরও...?

জহুরা জেসমিন শক্ত কণ্ঠে বললো, এর কোন পর নেই। তুমি গিয়ে মাস্টার সাহেবকে বলো, এটা আমার হুকুম। আমার হুকুম পালন করতে তার জান গেলেও তাকে তা করতে হবে। যাও শিগ্গির...!

জি, আচ্ছা!

চিন্তিত পদে বেরিয়ে গেল কদম আলী। সন্ধ্যা পেরিয়ে তখন রাত হয়েছে অনেকখানি। মাগরিব নামাজের পরেই জহুরা জেসমিনের আম্মাজান ফের এসে বারান্দার ঐ নির্দিষ্ট স্থানে বসেছিলেন আর তিনি সেখানে বসেই রইলেন। এই সময় বাইরে থেকে ফিরে এলেন মীর সাহেব অর্থাৎ জহুরা জেসমিনের আব্বা। আসার পথে তিনি দেখলেন মানিক বাবু মুখ গোমড়া করে একা একাই বসে আছেন বৈঠকখানার বারান্দায়। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মীর সাহেব সরাসরি বাড়ির ভেতরে এলেন আর বিবিকে সামনে পেয়েই প্রশ্ন করলেন, জহুরা কি স্বর্ণকারের বাড়ি থেকে ফিরেছে?

তাঁর বিবি সাহেবা অর্থাৎ জহুরা জেসমিনের আম্মা বললেন, কই নাতো!

মীর সাহেব বললেন, সেকি! মানিক বাবাজীকে যে বৈঠকখানার বারান্দায় একা একা বসে থাকতে দেখলাম! মুখ ভার করে!

বিবি সাহেবা চমকে উঠে বললেন, ওমা, সেকি? হতচ্ছাড়ি তাহলে যায়নি নাকি সোনারের বাড়িতে? মানিক বাবাজীকে সাথে যাওয়ার কথা বলায়, হতচ্ছাড়ী তাহলে কি অন্য কোথাও গেল? তার ঘরেও সে তো নেই!

বইঘর.কম ও রোকন

খুবই চিন্তিত হলেন মীর সাহেব। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তাজ্জব! ঘটনা কি তাহলে তো জানতে হয়।

বলেই তিনি কদম আলীকে ডাক দিয়ে মানিক বাবুকে বাড়ির ভেতরে ডেকে আনতে বললেন। কদম আলীর সাথে মানিক বাবু মীর সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালে মীর সাহেব প্রশ্ন করলেন, সেকি বাপজান, তুমি বাহির বাড়িতে একা একা বসে আছো যে! জহুরা কি তাহলে যায়নি স্বর্ণকারের বাড়িতে?

মুখ বেজার করে মানিক বাবু বললেন, গেছেন।

মীর সাহেব ফের তাজ্জব হলেন আর তাজ্জব কণ্ঠে বললেন, গেছেন! তুমি বাড়িতে রইলে আর সে গেল কি রকম? কার সাথে গেল?

মানিক বাবু ক্ষোভের সাথে বললেন, আপনাদের মাস্টারকে সাথে নিয়ে। আফাজ-হাফিজকে পড়ানো মাস্টারকে নিয়ে।

চমকে উঠলেন মীর সাহেব। বললেন, কাকে?

মানিক বাবু বললেন, আপনাদের বাজার সরকার ঐ সালাউদ্দীনকে সাথে নিয়ে। আমি সেজে-গুজে বসে রইলাম, কিন্তু মেয়ে আপনাদের আমার কোন খোঁজ করলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাইরে এসে শুনি, উনি অনেক আগেই আপনাদের মাস্টারকে সাথে নিয়ে সোনারের বাড়িতে চলে গেছেন।

ডুক্‌রে উঠলেন জহুরা জেসমিনের আম্মা। বললেন, ও মাগো! এই অবাধ্য মেয়েটাকে নিয়ে আর পারলাম না গো! বাপটা লাই দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলে নিয়েছেন! এখন ঠ্যালা বুঝুক! এই মেয়েটা যে কখন সবার মুখে চুনকালি দেবে, তার ঠিক কি?

বিবির মতো নিজেও বিচলিত হয়ে উঠলে মানিক বাবুর মনে ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে ভেবে মীর সাহেব নিজেকে সংযত করে নিয়ে ভিন্ন পথ মানে পরিস্থিতিটা তরল করার পথ ধরলেন। বিবিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আরে, এ নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? নিজের মাইনে করা লোক, মানে হুকুম বরদারকে সাথে করে নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই তার সুবিধে হবে বুঝেই। মেয়েছেলে মানুষ, পথে ঘাটে কখন কোন প্রয়োজন পড়ে তার কি ঠিক আছে? আমাদের মানিক বাবাজী সম্মানী আর বড় ঘরের ছেলে। পানি-টানি বয়ে দেয়ার মতো কোন ছোট কাজ করতে

তো মানিক বাবাজীকে হুকুম করতে পারবে না। মাইনে করা লোক দিয়ে সব রকম কাজই করিয়ে নিতে পারবে সে।

বিবি সাহেবা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তাই যদি মনে হলো তার, তাহলে আমাদের বাড়ির কাজের ঝিটাকে সাথে নিলো না কেন? মানিক বাবাজীর সাথে কাজের ঝিটাও যদি যেতো, তাহলে কি দোষ ছিল কিছু?

মীর সাহেব বললেন, না, তা ছিল না। তবে কথা হলো কি, কোন রান্নাবান্নার কাজে তো নয়, গহনার ডিজাইন পছন্দ করার কাজে মানিক বাবাজী সাথে থাকা সত্ত্বেও ঝিটাকে সাথে নিয়ে এসেছে দেখলে সেখানকার লোকজনেরা ভাবতো কি? সবাই কি হাসাহাসি করতো না? নানাজন কি নানারকম প্রশ্ন তুলতো না? মানিক বাবাজীর মান কি অক্ষুণ্ন থাকতো তাতে?

দমে গেলেন বিবি সাহেবা। খামোশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কেন, মান অক্ষুণ্ন থাকতো না কেন?

মীর সাহেব বললেন, সবাই ভাবতো, মানিক বাবাজীর চরিত্রটা বোধ হয় তেমন ভালো নয়। তাই তার সাথে একা আসতে সাহস না পেয়ে ঝিটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেয়েটা। এমনটি ভাবলে মানিক বাবাজীর মান থাকে, না মান থাকে আমারও?

বিবি সাহেব এবার আমতা আমতা করতে লাগলেন। বিবি সাহেবাকে ছেড়ে দিয়ে মীর সাহেব এবার মানিক বাবুকে প্রশ্ন করলেন, তুমিই বিবেচনা করে দেখো তো বাবাজী, তোমাকে মন্দ চরিত্রের লোক ভাবলে তোমার আমার দুজনেরই মান যায় কিনা? তুমি আমার হবু জামাই। এছাড়া, কত বড় মানী ঘরের ছেলে তুমি! মস্ত বড় মানী ঘরের ছেলে। সেই তোমার চরিত্র নিয়ে লোকে উল্টাপাল্টা ভাবলে সেটা কি মানহানির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না, বলো?

মস্ত বড় মানী ঘরের ছেলে বলায় মানিক বাবুর ক্ষোভ প্রায় সবটুকুই পড়ে গেল। গর্বে ফুলে উঠলো বুক তাঁর। তাই সংগে সংগে মীর সাহেবকে সমর্থন দিয়ে বললেন, জি, তা দাঁড়ায় তো বটেই! একশোবার দাঁড়ায়। আমার মতো প্রচণ্ড এক সম্মানী ঘরের ছেলের চরিত্র নিয়ে কেউ টানাটানি করলে মান-সম্মানে ঘা তো আমার লাগবেই।

বইঘর.কম ও রোকন

মীর সাহেব বললেন, তাহলেই বোঝ! আমার জহুরা আম্মার বিবেচনা আছে যথেষ্ট। তোমার মতো মানী ঘরের ছেলেকে কেউ অবিশ্বাস করে তোমাকে খাটো করুক, এটাও সে চায় না, ওদিকে আবার তোমাকে দিয়ে পানি-টানি বয়ে নেয়ার মতো কোন ছোট কাজ করে নিতেও চায় না। তাই বুদ্ধি করে সে তার মাইনে করা কাজের লোককে সাথে নিয়ে গেছে। এটা সে ঠিক করেনি, বলো?

কথার এমন ঘোরপ্যাঁচ বুঝে ওঠার মতো মগজ মানিক বাবুর ছিল না। ফলে মীর সাহেবের এ কথায় তিনি প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক করেছেন, ঠিকই করেছেন। চাকর-নফরের কাজ তো চাকর-নফরকে দিয়েই করাতে হয়। মানী লোককে দিয়ে তো করানো যায় না। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মেয়ে আপনার ঠিকই করেছেন।

সেই কথাই তো বলছি। তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে কিনা, তাই তোমার মান-সম্মানে ঘা লাগুক, এমনটি সে চায়নি।

চাচাজান!

তোমাকে সে যে কতটা মান্য করে এখন বুঝতে না পারলেও শাদিটা তোমাদের হয়ে গেলে তখন বুঝতে পারবে, তোমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা তার কতটা গভীর।

মীর সাহেব একজন দানাদার আর গুরুগম্ভীর লোক। এমন চাতুরিপূর্ণ কথাবার্তা তাঁকে মানায়ও না, কখনো তা তিনি বলেনও না। কিন্তু মানিক বাবুর সাথে জহুরার শাদি দেয়ার ব্যাপারে তিনি এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, এটুকু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। অন্য কথায়, বর হিসেবে মানিক বাবুকে অতিশয় মূল্যবান মনে হওয়ায় এমন বর হাত ছাড়া না করার তাকিদেই তিনি এমনটি করতে বাধ্য হলেন।

মানিক বাবুও এ আশ্বাসে গলে গেলেন। বিগলিত কণ্ঠে তিনি বললেন, ভুল হয়েছে চাচাজান, বুঝতে আমার ভুল হয়েছে বলেই মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দয়া করে ও নিয়ে আপনারা কেউ মনে কিছু করবেন না।

বাপজান!

www.boighar.com

ভুলটা আমার পুরোপুরিই ভেংগে গেছে। আর আমার কোনই ক্ষোভ নেই। এখন আমি খুশি চাচা মিয়া। মহাখুশি আমি এখন। হে, হে, হে...!

আহ্লাদের হাসি হাসতে হাসতে মানিক বাবু ফের বাহির বাড়িতে চলে গেলেন। মীর সাহেবের বিবি সাহেবা এবার নারাজ কণ্ঠে বললেন, এটা কি ঠিক হলো? মেয়ের এত বড় বেয়াদবীটা এভাবে চেপে যাওয়া কি উচিত হলো আপনার?

মীর সাহেব উষ্মার সাথে বললেন, তো কি করবো? তোমার মতো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে মানিক বাবাজীকে কি বিদায় করে দেবো? কত সাধ্যি-সাধনা করে ছেলেটাকে ধরে আনলাম জহুরার সাথে শাদি দেয়ার জন্যে। সেই শাদিটা কি ভেঙে দেবো এভাবে?

এই শাদিটা ভেঙে যাক, তা মীর সাহেবের বিবি সাহেবাও কখনোই চান না। এ কথায় তাই তিনি নরম সুরে বললেন, না না, শাদিটা ভেঙে যাক, এমন কাজ কি করতে আমি বলছি? আমি বলছি, ছেলেটাকে না হয় যা ইচ্ছা বোঝালেন। কিন্তু মেয়েটাকে তো আপনার ছেড়ে দিলে চলবে না! শক্ত শাসন করতে হবে তাকে। তার কার্যকলাপ বরাবর নীরবে সহ্য করে গেলে সে কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে আমাদের।

হ্যাঁ, তা যেতেই পারে। তুমি তার আম্মা। শাসন-ত্রাসন যা করতে হয় তুমিই করো। বাপ হয়ে আমি আর কি করবো বলো?

কিছু করতে না পারেন, তাকে আর কোন রকম প্রশ্রয় দেবেন না। তাকে লাই দেয়া বন্ধ করুন। সেই সাথে ঐ আপদটাকে, মানে মাস্টারটাকে আর রাখা যাবে না বেশি দিন। যথাশিগ্গির তাকে বিদায় করতে হবে, সে কথাটাও খেয়ালে রাখবেন।

মীর সাহেব টেনে টেনে বললেন, তা কথা হলো, মাস্টারের তো এখানে কোন দোষ চোখে পড়ছে না আমার।

বিবি সাহেবা ফের ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, তা পড়বে কেন? তাকে নিয়ে মেয়েটা যে আপনার বারবার এই রকম বাড়াবাড়ি করছে, তা দেখেও না দেখলে চোখে পড়বে কি করে?

বেগম!

সোনারের বাড়ি থেকে ফিরে এলে আজকেই ঐ আপদটাকে মানে আপনাদের ঐ সোহাগের সালাউদ্দীনকে ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতাম আমি। কিন্তু জহুরার শাদিটা হয়ে যাওয়ার আগে এটা করতে গেলে মেয়েটার অনেকখানি কেলেংকারী রটে যেতে পারে বলে দাঁতে দাঁত চেপে আপদটাকে সে কয়দিন সয়ে যেতে হবেই আর কি!

আপদটাকে আপাতত কিছু না বললেও মেয়েটাকে ছেড়ে দিলেন না মেয়ের আম্মাজান। অনেকখানি রাত করে সোনারের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে তিনি তেড়ে গেলেন জহুরা জেসমিনের ঘরে। গায়ের তামাম জ্বালা একত্র করে জহুরা জেসমিনের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ছি, ছি, ছি! বেহায়া, বেয়াদব, বেশরম মেয়ে! মান-ইজ্জতটা এভাবে ডুবিয়ে দিয়ে এলিরে হতচ্ছাড়ি!

মায়ের জিহ্বায় যে অনেকখানি বিষ আছে জহুরা জেসমিন তা জানে। মায়ের কথায় তাই ঘাবড়ে না গিয়ে জহুরা জেসমিন শক্ত কণ্ঠে বললো, মান-ইজ্জত ডুবিয়ে দিয়ে এলাম কি রকম?

আম্মা বললেন, মানিক বাবাজীকে রেখে ঐ হতচ্ছাড়া মাস্টারকে সংগে নিয়ে সোনারের বাড়িতে গেলে কেন?

মান-ইজ্জতটা যাতে করে ডুবে না যায়, সেজন্যে।

মান-ইজ্জতটা ডুবে না যায় মানে? এত রাত পর্যন্ত ঐ একটা কামলা-মজুর মানুষকে সংগে নিয়ে এই যে নেচে-কুঁদে এলে তাতে ইজ্জতটা কি তোমার না ডুবে অক্ষুণ্ন আছে এখনো?

আলবত আছে। থাকবেও সব সময়।

আর আমাদের মানিক বাবাজীকে সাথে করে নিয়ে গেলে তোমার ইজ্জতটা বুঝি তলিয়ে যেতো পানির তলে?

অথৈ তলে তালিয়ে যেতো। খাড়া-তলানো তলিয়ে যেতো ইজ্জত আমার।

তার মানে? মাস্টারকে সাথে নেয়ায় ইজ্জত তোমার ডুবলো না, আর মানিক বাবাজীকে সাথে নিলেই ডুবে যেতো ইজ্জত তোমার?

বলছিই তো, নির্ঘাত ডুবে যেতো। সেটা বুঝেই তো ঐ মাস্টার সাহেবকে সাথে নিতে হয়েছে আমার?

আশ্চর্য! তাহলে কি ঐ মাস্টারটার চরিত্র দুধে ধোয়া?

একশো ভাগ দুধে ধোয়া।

আর ঐ মানিক বাবাজীর চরিত্র বুঝি দূষিত? ফের জ্বলে উঠলেন আম্মাজান। বললেন, খবরদার! যা 'নয়' তাকে 'হয়' করো না বেহায়ার মতো।

যা ‘হয়’, তাকে ‘নয়’ করবো কি করে?

তাহলে ঐ মাস্টারটাই হলো চরিত্রবান আর আমাদের মানিক বাবাজী চরিত্রহীন?

ঠিক চরিত্রহীন না হলেও চরিত্রবান যে সে কখনো নয়, এটা আমি নিশ্চিতভাবে বুঝে গেছি।

বুঝে গেছো? কিভাবে বুঝলে?

তার আচরণে। হায়েনার মতো তার লোলুপ দৃষ্টি দেখে। সুযোগ তাকে দিলেই যে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর তার হাবভাব দেখেই আমি তা বুঝে ফেলেছি সন্দেহাতীতভাবে।

জহুরা!

বিনা অনুমতিতে যে আমার ঘরে ঢুকে জোর করে আমার শ্লীলতাহানি করতে চায়, তার চরিত্র বুঝতে কি কিছু বাকি থাকে আমার?

আর ঐ মাস্টারটা কি সে চেষ্টা করেনি কখনো?

এক মুহূর্তের জন্যেও নয়, বরং আমাকে হেফাজত করার জন্যে সে জান কোরবান করতে তৈরি থাকে সব সময়।

কিন্তু ঐ মানিক বাবাজী তো হবু বর তোমার!

সেটা আপনারা ভাবতে পারেন, আমি কখনও ভাবিনে। কোন লম্পট আমার বর হতে পারে না!

লম্পট! কাকে কি বলছো? কে তোমার বর হতে পারে না? কত বড় মানী ঘরের ছেলে সে তা কি জানো? জানো ওদের ধন-সম্পদের পরিমাণটা কতখানি?

জানি বৈ কি! ইট পুড়িয়ে পুড়িয়ে অনেক টাকা করেছে তারা, এ কথা শুনেছি। তবে লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কহীন স্রেফ পয়সা কামানো মানুষের ঘর কতখানি মানী ঘর হয়, তা আমার জানা নেই।

ফুঁসে উঠলেন আম্মাজান। বললেন, লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কহীন কি রকম? কারা লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কহীন? জানো আমাদের মানিক বাবাজী একজন রীতিমতো ম্যাট্রিক পাস ছেলে?

হ্যাঁ, শুনেছি ঘষে-মেজে ম্যাট্রিকটা পাস করেছে সে। তবে বিদ্যা কিছু পেটে তার আছে এমনটি মনে হয়নি কখনো।

হাল ছাড়লেন না আম্মাজান। বললেন, তবু তো সে ম্যাট্রিক পাস। তুমি যাকে নিয়ে ঘোরো তোমার সেই ভবঘুরে মাস্টারের তো কোন পাসই নেই। ঐ মাস্টারের চেয়ে মানিক বাবাজী কি শত গুণে উত্তম ছেলে নয়?

বইঘর.কম ও রোকন

না। কোন দিক দিয়েই নয়। না চেহারায়, না চরিত্রে, না বিদ্যায়। কোন পাস না থাকলেও ঐ ভবঘুরে মাস্টারের বিদ্যাটা যতখানি মজবুত, তোমাদের ঐ সাধের লাউ মানিক বাবু তো কোন্ ছার, অনেক আই.এ. বি.এ. পাস লোকের বিদ্যাও ততখানি মজবুত নয়।

বটে! এতটাই সে বিদ্বান?

কতটা তা আমাদের হানিফ স্যারকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে, তাহলেই তা সঠিক জানতে পাবেন।

আমার দায় পড়েছে একটা হাভাতে ঘরের ছেলের বিদ্যাটা যাচাই করে দেখার! আমাদের মানিক বাবাজী একাধারে বিত্তবান আর ম্যাট্রিক পাস ছেলে। তোমার মতো কলেজে না পড়লেও তার লেখাপড়াও আছে, ঘরে অঢেল ভাতও আছে। আর কি চাই? সব দিক দিয়েই সে আকষর্ণীয় বর। বরের যোগ্যতা বিচারে কী নেই তার?

সবই আছে, তবে চরিত্রটা তার বড়ই নড়বড়ে। কনেরা যে জিনিসটা সবার আগে দেখে, সেই চরিত্রটা সে মজবুত করতে পারেনি।

সব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ে শাদির আগে ছেলেরা অমন একটু উচ্ছৃঙ্খলই হয়। ঘরে বউ এলে ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা আর থাকে না। তখন সে ধীর স্থির আর সুশীল-সুজন হয়ে যায়। বিয়েটা তোমাদের হয়ে যাক, তখন বুঝবে কথাটা আমার ঠিক কিনা!

আমার বুঝে কাজ নেই। যতটা পারেন আপনারাই সেটা বুঝুনগে।

আমরাই বুঝবো?

বাহ! আপনাদের এত মনেধরা ছেলে, আপনারা বুঝবেন না তো বুঝবে কে?

প্রজ্ঞাপন জারির মতো আম্মাজান দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, দেখো জহুরা, তুমি যতই দোষ-ত্রুটি ধরো, আমরা ওর সাথেই শাদি দেবো তোমার। কাজেই সব সময় তাকে হীন চোখে না দেখে সম্মানের চোখে দেখতে শেখো, নইলে ভবিষ্যতে তোমাকেই পস্তাতে হবে, আমরা পস্তাতে যাবো না!

আচ্ছা!

নিজেকে সেভাবে তৈরি করে নাও। মেয়েছেলের এত জিদ্ ভালো নয়। মেয়েছেলের কার কপালে কি আছে, কে বলতে পারে? কপাল ভালো হলে সৎ-অসৎ সব বরই ভালো, বুঝলে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঘুরে দাঁড়ালেন জহুরা জেসমিনের আম্মাজান এবং বিড় বিড় করতে করতে তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন।

৫

মীর সাহেবের কথায় মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবু সেই যে সেদিন আহ্লাদভরে অন্দর থেকে বাহির বাড়িতে চলে এলেন, সেই থেকেই তিনি খুশিতে টইটম্বুর হয়ে রইলেন। সেই সাথে কিভাবে জহুরা জেসমিনকে কাছে পাওয়া যায়, বসে বসে কেবলই সেই পরিকল্পনা আঁটতে লাগলেন। চিন্তা করে অবশেষে স্থির করলেন বনভোজনের অর্থাৎ পিক্‌নিকের আয়োজন করলে জহুরা জেসমিনকে অতি সহজে নাগালের মধ্যে, চাই কি, বগলের মধ্যেই পাওয়া যাবে! পিকনিক মানেই তো মুক্ত ময়দানে জোড়ায় জোড়ায় জড়াজড়ি করে ছুটে বেড়ানো। বিমুগ্ধ কপোত-কপোতীর মতো একে অন্যকে পাখায় পাখায় বেঁধে ফেলার প্রশস্ত মওকা।

ওদিকে আবার সুবুদ্ধি তেমন না থাকলেও কুবুদ্ধির কিছুমাত্র ঘাটতি ছিল না মানিক বাবুর মাথায়। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, পিকনিকের আয়োজন করতে চারটে পয়সা খরচ হবে না নিজের তাঁর। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। তাঁর এই খাহেশের কথা মীর সাহেবকে জানালে মীর সাহেব জরুর তাঁর এই খাহেশ পূরণে পিছপা হবেন না। হবু জামাই বলে কথা! আদর-যত্নের মাত্রা দেখেই মানিক বাবু ধরে নিয়েছেন, যৌতুক হিসাবে দশ বারো লাখ হাসতে হাসতেই যেখানে দিয়ে দেবেন মীর সাহেব, সেখানে পিকনিকের জন্যে কয়েক হাজার অকাতরেই খরচ করতে রাজী হবেন তিনি। হলেনও তাই। মীর সাহেবের কাছে প্রস্তাবটা রাখতেই মীর সাহেব খোশ কণ্ঠে বললেন, বেশ তো! পিকনিকে যাবে, যাও। খরচ-টরচ যা লাগে তা সব আমিই দেবো।

বর্তে গেলেন মানিক বাবু। হাসি মুখে বললেন, জি চাচাজান, জি জি। এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি। টাকা-পয়সা সব আমার বাড়িতে। এখানে তো সাথে কোন পয়সা-কড়ি নেই। তাই পিকনিকের আয়োজনটা...!

মীর সাহেব ফের হৃষ্টচিত্তে বললেন, আরে তাতে কি! তাতে কি হয়েছে? তুমি আমার হবু জামাই। পয়সা সাথে নেই তো কি হয়েছে? আমি তো আছি। আয়োজন করো। পিকনিকের খরচ যা লাগে, সবই আমি দেবো।

মীর সাহেবের চিন্তা-ভাবনা মানিক বাবুর বিপরীত। প্রচুর টাকার মানুষ। ফুর্তি-ফার্তার পয়সাটা যোগান দিলেই মানিক বাবু খুশি হয়ে বিয়ে করবেন তাঁর মেয়েকে। যৌতুক-টৌতুকের প্রশ্ন কিছু তুলবেন না। এই ধারণাই করে আছেন মীর সাহেব ও তাঁর বিবি সাহেবা দুজনই। মানিক বাবুর এই প্রস্তাবে তাই তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন মীর সাহেব। অত:পর জিজ্ঞেস করলেন, তা বাবাজী কাদের নিয়ে পিকনিক করতে চাচ্ছো?

জবাবে মানিক বাবু বললেন, এখানকার সম্মানী ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ইতিমধ্যেই তাদের অনেকের সাথে আমার পরিচয় আর বন্ধুত্ব হয়েছে কিনা, তাদের নিয়েই পিকনিকে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি আমি।

তা বেশ। কিন্তু তারা কি তোমার সাথে পিকনিকে যেতে রাজী হবে?

কি যে বলেন চাচাজান? বিনে পয়সায় পেলে এ দেশের মানুষ নাকি আল্‌কাতরাও খায়, বিনে খরচে পিকনিক খেতে যাবে না মানে আলবত যাবে। খরচ তো কিছু লাগছে না তাদের। চাঁদা-টাদাও কিছুই দিতে হচ্ছে না। সব খরচ তো আমাদের। তারা যাবে আর খাবে। দাওয়াত পেলে দেখবেন, কেমন ভিড় করে ছুটে আসে তারা!

ও আচ্ছা!

কোন সেকেলে ছেলেমেয়েদের দাওয়াত তো আমি করবো না। পরের পয়সায় পিকনিক খেতে যারা ইতস্তত করবে না, সেকেলে মানসিকতা যাদের নেই, সেই সব ছেলেমেয়েকেই দাওয়াত করবো আমি। মানে পুরোপুরি আপ্-টু-ডেট আর অগ্রসর ছেলেমেয়েদের দাওয়াত দেবো। অগ্রসর আর আধুনিক ছেলেমেয়েরা ঐ সব সেকেলে লজ্জাবোধের ধার ধারে না এক বিন্দুও। দাওয়াত পাওয়ামাত্রই উল্লাসভরে ছুটে আসবে তারা।

বেশ, বেশ! তা এ বাড়ি থেকে তুমি একাই যাবে, না...?

আরে না না, একা যাবো কেন? আপনারা বৃদ্ধ আর ময়-মুরুব্বী মানুষ। আপনাদের পিকনিকে যাওয়া মানাবে না। আপনি আর চাচী আম্মাজান ছাড়া এ বাড়ির সবাই যাবে। আপনার মেয়েসহ অন্য সবাই।

অন্য সবাই?

জি, জি! চাকর-বাকরদেরও সবাইকে নিয়ে যাবো। তারা না গেলে পিকনিকের কাজ-কামগুলো করবে কে? কাম্‌লা-মজুর দিয়ে তো সব কাজ হবে না। কাজেই চাকর-বাকরদের সাথে আপনাদের ঐ মাস্টারটাকেও সাথে নেবো আমি। জোয়ান তাজা লোক। অনেক উপকারে লাগবে সে আমাদের।

কথা মতোই কাজ হলো। মহানন্দে দৌড়-ঝাঁপ করে অতি আধুনিক আর অতি আধুনিকাদের খুঁজে খুঁজে বের করলেন মানিক বাবু এবং দাওয়াত দিলেন পিকনিকের। মানিক বাবুর চিন্তা-ভাবনাই ঠিক। এ যুগে যেমন অভাব নেই অতি আধুনিক আর অতি আধুনিকাদের, সর্বত্রই এদের ব্যাপ্তি, তেমনই লজ্জা-শরমের বালাইও নেই এদের। বিনে খরচে পিকনিক খাওয়ার মওকা পেয়েই নেচে উঠে খাড়া হলো তারা। পিকনিক-অনুষ্ঠান, নাচানাচি আর হৈ হুল্লোড়ের মওকা পেলে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিতে রাজী এরা, পিকনিকের মতো দৌড়-ঝাঁপ আর দাপাদাপির সুযোগ কি এরা কখনো ছাড়ে? নির্দিষ্ট দিনে এক ডাকে পিকনিক স্পটে ছুটে এলো এক পাল যুবক-যুবতী ওরাং-বসের পূজারীরা।

জহুরা জেসমিন স্বেচ্ছায় এ পিকনিকে আসতো না। আসতে সে বাধ্য হলো বাপ-মায়ের পীড়াপীড়িতে আর সালাউদ্দীনের কারণে। মীর সাহেবের চাপে পড়ে বাড়ির চাকর-নফরের সাথে গৃহশিক্ষক সালাউদ্দীনও যখন বাধ্য হলো মানিক বাবুর পিকনিকে যোগদান করতে, তখন জহুরা জেসমিন আর চুপ থাকতে পারলো না। খোলা মনের সাদাসিধে মাস্টারটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঐ দুষ্টুমতি মানিক বাবু যে কি হেস্ত নেস্ত করবে তার ঠিক কি! এটা বুঝতে পেরেই জহুরা জেসমিন অধিক আপত্তি না করে সবার সাথে চলে এলো এই পিকনিকে। সালাউদ্দীনকে একা একা ওর সাথে ছাড়লো না।

নাম বনভোজন হলেও গভীর বনের মধ্যে নয়, কিছু গাছ-গাছড়ায় ঘেরা মাঠের মধ্যে বসে গেল বনভোজনের আসর। বিশাল আকারের ফরাশ পেতে বসে গেলো আমন্ত্রিত যুবক-যুবতীদের একাংশ। বাকি অংশ নেচে গেয়ে বেড়াতে লাগলো এই ফরাশের চারপাশে। ফরাশের ওপর চলতে লাগলো দাবা, লুডু, তাস আর বাঘ-বক্‌রী খেলা। ঐ ফরাশটাকে কেন্দ্র করে একটু দূর দিয়ে চলতে লাগলো রান্না-বান্না, কুটা-বাছা আর

মাজা-ঘষার কাজ। কর্মরত চাকর-বাকর আর বাবুর্চিদের হট্টোগোলের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলো গার্ল ফ্রেন্ড আর বয় ফ্রেন্ডদের মধ্যে ভ্যালেনটাইন দিবসের হাসাহাসি আর মাতামাতি। বাজতে লাগলো অডিও সিডি। সেই সাথে চলতে লাগলো চোখের ঠারে, মুখের ভাষায় আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে একে অন্যকে কাছে টানার নিরন্তর প্রয়াস।

জহুরাকে কাছে টানার দুর্বার গরজেই মানিক বাবুর এই আয়োজন। অতি আধুনিক আর অতি আধুনিকারা একে অন্যকে কাছে টানার মতোই মানিক বাবু শুরু থেকে জহুরা জেসমিনকে কাছে টানার প্রয়াস চালাতে লাগলেন। কিন্তু জহুরা জেসমিন আদৌ কোন আধুনিকা না হওয়ায় মানিক বাবুর সে প্রয়াস সফলকাম হলো না।

মানিক বাবু বসেছিলেন ফরাশের মাঝখানে। জহুরা জেসমিন এসে তার পাশে বসুক, এই ছিল তার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জহুরা জেসমিন এসে জড়সড় হয়ে বসলো ঐ ফরাশের একদম এক প্রান্তে। মানিক বাবু শশব্যস্তে জহুরাকে ফরাশের মাঝখানে এসে বসার প্রস্তাব দিতে যেতেই ঘটে গেল এক বিপত্তি। জহুরা জেসমিনের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সালাউদ্দীন জহুরা জেসমিনের আহ্বানে এই সময় সালাউদ্দীন এসে জহুরা জেসমিনের পাশ ঘেঁষে বসলো, তা দেখে হৈ হৈ করে লাফিয়ে উঠলেন মানিক বাবু। সালাউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আরে এই, এই, তুমি ওখানে বসছো কেন? ওঠো, ওঠো।

ক্ষেপে গেল জহুরা জেসমিন। মানিক বাবুকে উদ্দেশ্য করে জহুরা জেসমিন শক্ত কণ্ঠে বললো, উঠবে মানে? উঠে ও কোথায় যাবে?

মানিক বাবু নির্দ্বিধায় বললেন, কাজে যাবে। ঐ যে ওখানে ফাঁড়াই করা একগাদা খড়ি আছে, ওগুলো চুলোর পাশে পৌঁছে দেবে, পানি-টানি বয়ে দেয়াতেও ও নাকি খুব দক্ষ। সামনের ঐ দীঘি থেকে কয়েক ভাড় পানি বয়ে এনে দিলেও থালা-বাসন মাজা-ধোয়ার কাজে লাগবে। বাতাস দিয়ে চুলোর আগুনটা জম্‌কে দিলেও একটা কাজ হয়। বাবুর্চিরা আরামে পাক-শাক করতে পারবে আর তাতে খাবার-দাবারগুলো সুস্বাদু হবে। কাজের কি শেষ আছে?

তা ও সব কাজ এই মাস্টার সাহেব করবে কেন?

কে করবে?

এক গাদা টাকা খরচ করে এক পাল মজুর-কামিন এনেছেন, কিসের জন্যে? তারা করবে। তাতেও যদি না হয়, আপনারা করবেন। মাস্টার সাহেব করবে কেন?

আরে, আরে! বলে কি! ঐ মাস্টারটা বসে থাকবে আর আমরা যাবো খড়ি-পানি বয়ে দেয়ার কাজে?

তাহলে আপনারা বসে থাকবেন আর মাস্টার সাহেব ঐ মজুরদের কাজে যাবে কেন? তামাসা পেয়েছেন?

জহুরা জেসমিনকে চটালে তাঁর ইষ্ট সাধন হবে না বুঝে রুষ্ট হওয়ার বদলে মানিক বাবু নরম সুরে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোন কাজ-কাম না করে আপনার ঐ মাস্টারটা এখান থেকে উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বসুক। ব্যস! আর আমার কিছু বলার নেই।

জহুরা জেসমিন একই রকম শক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, ও এখান থেকে উঠে যাবে কেন?

www.boighar.com

মানিক বাবু বললেন, আহা বুঝছেন না কেন? এটা হলো শিক্ষিত আর অগ্রসর মানুষের বসার জায়গা। ঐ মাস্টারের মতো সেকেলে আর অর্ধ শিক্ষিত মানুষ এই ফরাশে থাকলে, এই সব ভদ্র আর সম্মানিত মানুষের মান থাকে?

বটে! মাস্টার সাহেব অর্ধ শিক্ষিত আর আপনার এই সব মেহমানরা শিক্ষিত মানুষ? কতখানি বিদ্যা পেটে আছে আপনার এই মেহমানদের? মানুষের চালচলন আর স্বভাবেই বিদ্যার পরিমাণটা প্রতিফলিত হয়। এদের স্বভাব আর চালচলন যা দেখছি, তাতে মাস্টার সাহেবের বিদ্যার অর্ধেকটাও যে পেটে আছে এদের সবার, তা কখনোই মনে হয় না। আপনি নিজেও তো ম্যাট্রিক পাস লোক বলে বড়াই করেন। বিদ্যার প্রতিযোগিতায় নামলে কি অর্ধশিক্ষিত এই মাস্টারের বিদ্যার সামনে একটা মিনিটও টিকে থাকতে পারবেন আপনি? আর ভদ্রতার কথা বলছেন? আপনার আমন্ত্রিত এই সব অতি আধুনিক আর অতি আধুনিকার যে আচরণ লক্ষ করছি এখানে এসে, তাতে ভদ্রতা কাকে বলে এই মাস্টার সাহেবের কাছে কয়েক বছর ধরে নিরন্তর ছবক নিলেও, ভদ্রতা বস্তুটি এরা আয়ত্ত করতে পারবে এমনটি মনে হয় না।

আমোদ উল্লাসে ব্যাঘাত ঘটায় উপস্থিত মেহমানদের একজন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো, আরে কি সব কচ্‌কচানি শুরু করেছেন আপনারা? ঐ লোকটা এই ফরাশ থেকে উঠে গেলেই তো চুকে যায় সব ল্যাঠা।

বইঘর.কম ও রোকন

সালাউদ্দীন এবার সবেগে উঠে দাঁড়ালো ফরাশ থেকে এবং শানিত কণ্ঠে বললো, যাচ্ছি, কেউ অনুরোধ করলেও এই কেষ্টলীলার আসরে আমি আর এক মুহূর্তও থাকবো না। যুবক-যুবতীদের এই ফ্রি স্টাইল ঢলাঢলির আসরে কোন ভদ্র লোকেরই রুচি হবে না অধিকক্ষণ বসে থাকার। আমি চললাম।

সালাউদ্দীন উঠে সামনের দিকে পা বাড়াতেই জহুরা জেসমিন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, সেকি! সেকি! উঠে তুমি কোথায় যাবে?

সালাউদ্দীন বললো, যাবো আর কোথায়?

এই সময় বাড়িতে ফিরে গেলেও মানিক বাবুকে অপমানিত করা হলো আর ওদিকে আপনার আব্বা-আম্মাও ভীষণ নাখোশ হবেন আমার ওপর। তাই যেখানেই হোক, এখান থেকে সরে আমাকে যেতেই হবে।

কেন যাবে? কার ভয়ে যাবে? আমার আব্বার টাকায় আয়োজন করা পিকনিক। এখানে থাকতে তোমাকে বাধা দেয় এমন সাধ্য আছে কার?

সালাউদ্দীন বললো, যে জঘন্য প্রেমলীলা শুরু হয়েছে এখানে, তাতে বাধা কেউ না দিলেও এখানে থাকলে আমি অপমানিত হবো নিজের কাছে নিজেই। আপনি কেন এসেছেন এখানে? এই বেপর্দা আর বেআব্রুদের বেহায়াপনার মহোৎসবে আপনি কেন যোগ দিতে এসেছেন?

জহুরা জেসমিন খেদের সাথে বললো, সাধে কি আর এসেছি? আমার বাপ-মা সব সময়ই এই লোকটার সাথে আমাকে জাহান্নামে পাঠাতে এক পায়ে খাড়া আছেন বলেই আসতে হয়েছে আমাকে।

বেশ, থাকুন তাহলে এই জাহান্নামে, আমি চললাম মেম সাহেব!

রওনা হলো সালাউদ্দীন। পিকনিক স্পটের ঐ এরিয়া থেকে খানিকটা দূরে এসে একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়লো সে। জহুরা জেসমিন একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সালাউদ্দীনের গমন পথের দিকে।

এদিকে ফরাশের ওপর মানিক বাবুর পাশেই একজন প্রায় অর্ধোলঙ্গ সুন্দরী যুবতী দাবার ছক বিছিয়ে নিয়ে খেলায় মানিক বাবুর যোগদানের অপেক্ষায় ছিল। জহুরা জেসমিন ও সালাউদ্দীনের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকায় খেলায় যোগ দিতে দেরী হচ্ছিল মানিক বাবুর। সালাউদ্দীন উঠে গেলে ঐ যুবতী মানিক বাবুকে তাকিদ দিয়ে বললো, আরে ঘুরুন তো এদিকে। সেকেলে আর অনগ্রসর মানুষদের সাথে কী সব ফালতু তর্ক

করছেন। পিকনিকের আনন্দটাই মাটি করে দেবেন নাকি এই করে? দিন, চাল দিন...!

ঘুরে বসলেন মানিক বাবু। ইঞ্চি কয়েক ব্লাউজ দ্বারা স্ফীত পীনস্থল ঢাকার ক্ষীণ একটা চেষ্টা করা সুন্দরী যুবতীটির দিকে চেয়েই আকৃষ্ট হলেন মানিক বাবু। তিনি সাময়িকভাবে ভুলে গেলেন জহুরা জেসমিনদের প্রসঙ্গ এবং প্রফুল্ল চিত্তে লিপ্ত হলেন ঐ সুন্দরীর সাথে দাবা খেলায়।

এদিকে জহুরা জেসমিনও উঠে গেল ফরাশ থেকে। একটা চাদর হাতে সে চলে এলো সালাউদ্দীনের কাছে। সালাউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সেকি! আপনিও এখানে চলে এলেন যে?

জহুরা জেসমিন বললো, আসবো না তো কি ওখানে বসে বসে ঐ বেহায়াদের বেহায়াপনা দেখবো? খেলাধুলা আর আমোদ-উল্লাসের নামে ওরা একের কোলের ওপর অন্যজন যেভাবে ঢ়লে পড়ছে, তা দেখলে লজ্জা পাবে খোদ শয়তানটা। একেই বলে 'রতনে রতন চেনে, পচানি চেনে পচু; শকুনে ভাগাড় চেনে, শূকরে চেনে কচু।'

সালাউদ্দীন প্রশ্ন করলো, অর্থাৎ?

জহুরা জেসমিন বললো, ঐ মানিক বাবুর কথা বলছি। নিজে তিনি শূকর মার্কা লোক বলেই বেছে বেছে জংলা কচুর মতো এই সব জংলী নারী-পুরুষ যোগাড় করে এনেছেন। সালাউদ্দীন হেসে বললো, তা বটে, তা বটে!

হাতের চাদরটা মেলে ধরে জহুরা জেসমিন বললো, নাও, একটু ওঠ তো দেখি। এই চাদরটা পাতি।

চাদর পেতে আপনিও এখানে বসবেন নাকি?

আলবত! এতে কি সন্দেহ আছে? এই ফাঁকে আর নিরিবিলিতে একটু বসে থাকি তোমার পাশে। ঐ সব হৈ চৈ আমার একেবারেই অসহ্য। ওখানে আর যাবো না।

কিন্তু এখানে থাকলে তো আপনার নাস্তা আর দুপুরের খানা কিছুই খাওয়া হবে না মেম সাহেব!

জহুরা জেসমিন স্মিত হাস্যে বললো, হবে, হবে। সবই হবে। আমি তুমি কেউই অভুক্ত থাকবো না। নাস্তা আর দুপুরের খানা যথাসময়ে চলে আসবে এখানে।

কদম আলীকে আর আমাদের বাড়ির চাকর-বাকরদের সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছি। সব কিছুই তারা যথাসময়ে পৌঁছে দেবে এখানে।

বইঘর.কম ও রোকন

বলেন কি! এটা তো তাহলে বনভোজন হবে না, হবে মাঠভোজন, অথচ আপনাকে সাথে নিয়ে...!

আমাকে সাথে নিয়ে এক আসনে বসে খানা খাওয়ার আর মাতামাতি করার কতই না খাহেশ ছিল ঐ মানিক বাবুর, তাই না?

জি, জি। আমি তো মনে করি, এই বনভোজনে আসার এইটেই ছিল মানিক বাবুর মুখ্য উদ্দেশ্য।

মুখ্য-সুখ্য নয়, এইটেই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাহলে? এখনই তো তাহলে তিনি খোঁজ করবেন আপনার!

করুন। তাঁর খোঁজাখুঁজিতে গুরুত্ব দেয়ার কিছু মাত্র আগ্রহ আমার থাকলে তো!

কিন্তু আপনি এখানে আমার সাথে সারাক্ষণ থাকলে....

জহুরা জেসমিন ঠোঁট টিপে হেসে বললো, ভয় নেই, ওদের মতো তোমার কোলে ঢলে পড়বো না আমি।

সালাউদ্দীন লজ্জিত কণ্ঠে বললো, তওবা, তওবা! কী যে বলেন? আমি কি সেই কথা ভাবছি? আমি ভাবছি, এতে অন্যেরা কি মনে করবে—সেই কথা।

করুক। যারা আমাদের জানে না তারা যা খুশি তাই মনে করুক। ওতে তোমার আমার কিছুই এসে যাবে না। কারণ আমাদের যারা জানে, তারা এ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে যাবে না।

এদিকে শীঘ্রই হুঁশে এলেন মানিক বাবু। যে উদ্দেশ্যে তাঁর এই পিকনিকের আয়োজন করা অর্থাৎ জহুরা জেসমিনকে কব্‌জা করার উদ্দেশ্যটা তাঁর ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে–এ খেয়ালটা মাথায় আসতেই দাবার ছক থেকে ঘুরে বসলেন তিনি এবং খোঁজ করলেন জহুরার। ফরাশের সর্বত্র নজর দিয়ে দেখেই তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আরে আরে সেকি! জহুরা জেসমিনকে তো দেখছিনে? উনি কোথায়?

নাখোশ হলো দাবা খেলার পার্টনারটি। মুখ ভার করে সে করুণীটি বললো, তা যেখানেই যাক, ওকে নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা কি পাশে নেই আপনার? জহুরার চেয়ে সবাই কি আমরা খুবই কম সুন্দরী? এতজন আমরা আপনাকে ঘিরে বসে আছি, তবু কি মন ভরছে না আপনার?

বইঘর.কম ও রোকন

মানিক বাবু জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললেন, না, মানে জহুরাকে কব্জা করা এখন আমার খুবই জরুরী কিনা, ওকে লক্ষ করেই আমি ও বাড়িতে এসেছি। ও ফস্কে গেলে...!

পাশে বসা আর এক তরুণী টিপ্পনী কেটে বললো, ও ফস্কে গেলে আপনার খুবই ক্ষতি হবে, তাই না?

মানিক বাবু দ্রুত সায় দিয়ে বললেন, জি, জি, ঠিকই ধরেছেন আপনি।

কিন্তু ঐ জহুরাটা কি আদৌ আপনার আয়ত্তে আছে, না ছিল কখনো?

অর্থাৎ?

দূরে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দ্বিতীয় যুবতীটি বললো, ঐ যে, ঐ মাঠের মধ্যে চেয়ে দেখুন, যার আয়ত্তের মাল তার আয়ত্তে ঠিকই চলে গেছে।

দূরে লক্ষ করে মানিক বাবু চঞ্চল কণ্ঠে বললেন, আরে তাই তো! ঐ যে ঐ দূরে দুজনকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে, কে ওরা? জহুরা জেসমিন আর সালাউদ্দীন নয়?

জি, জি। তো আর বলছি কি?

দাবা খেলনেওয়ালী তরুণীটি শ্লেষভরে বললো, আপনার রুচিটা কেমন শুনি? ঐ একটা ভ্রষ্টা মেয়েকে শাদি করার এতটা আগ্রহ আপনার কিসের?

ভ্রষ্টা!

নয় তো কি? আপনি না জানলেও আমরা অনেকেই জানি, ওদের ঐ মাস্টারটার গলা ধরে জহুরাটা ঝুলে আছে অনেকদিন আগে থেকেই। ওরা প্রায় স্বামী স্ত্রীই বনে গেছে! জহুরার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। একে বিয়ে করলে আপনি কি ওর মন পাবেন কখনো? বলুন, পাবেন?

মানিক বাবু এবার স্বরূপে ফিরে এলেন। বললেন, আরে দূর মন কে চায়? ওকে আমার শাদি করা প্রয়োজন, তাই শাদি ওকে করতেই হবে আমার!

হবেই? অন্যের প্রেমে ডুবে থাকা ঐ মেয়েটাকেই শাদি করার এত আগ্রহ আপনার? অন্যের ভোগে লাগা মেয়েটাকে শাদি করতে গা আপনার ঘিন্‌ঘিন্‌ করবে না?

ঘিন্ ঘিন্ করবে কেন? লোকে তো বিধবা বা ডিভোর্সী মেয়েদের নিকাহ্‌ও করে। সেই মতো নিকাহ্ করবো আমি।

বাপরে বাপ! মেয়েটার রূপ দেখে এতটাই ভুলে গেছেন?

মানিক বাবু জোরালো কণ্ঠে বললো, রূপ দেখে নয়, মেয়েটার বাপের রূপা অর্থাৎ রুপিয়া দেখে, নইলে ও রকম রূপের গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে আছে আমার। ওর রূপ আর প্রেমে প্রয়োজনটা কি আমার? আমি চাই ওর বাপের রূপা অর্থাৎ টাকা।

ওর বাপের টাকা?

আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, নগদ টাকা। দশ বারো লাখ টাকার আমার বড়ই দরকার। আমাদের ইট পোড়ানো কারবারটা আর একটু চাঙ্গা করে তুলতে ঐ পরিমাণ টাকাই দরকার। ওর বাপটা আমাকে ঐ পরিমাণ টাকা দেবে তো শাদি হবে, না দেবে তো গুড্‌বাই। ও রকম অনেক মেয়ে পড়ে আছে আমার আশায় কত শত! আমি চাইলেই তারা দশ বারো লাখ কোন কথা, পনের-বিশ লাখ টাকা দিয়েও মেয়ের বাপ খুশি হয়ে আমার সাথে শাদি দেবেন।

দ্বিতীয় যুবতীটি এবার সবিস্ময়ে বললো, বলেন কি! তাহলে জহুরা জেসমিনের রূপ দেখে বা তার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে আসেননি আপনি?

আরে ছ্যা! রূপ বা প্রেমের কোন ধার ধারি আমি? আমার সম্পর্ক টাকার সাথে। টাকা আছে তো আমি আছি, টাকা নেই তো আমিও নেই।

কেমন কথা, কটা টাকা দিয়েই যদি জহুরার বিয়ে দেয় আপনার সাথে, আপনার মানসিকতা এই রকম হলে তাকে নিয়ে ঘর করবেন কি করে? এতে কি কোন শান্তি পাবেন আপনি?

দূর দূর! আমার বয়ে গেছে ঘর করার! টাকাটা হাতে পেলে যেখানের মেয়ে সেখানেই ফেলে রেখে আমি এমনভাবে কেটে পড়বো যে, তারা আর কোনদিন ধরতেই পারবে না আমাকে।

ঐ ফরাশের ওপর মিস্ জরিনা বা জরিনা হক নামের আর এক আধুনিকা বসেছিল ওদের পাশেই। আধুনিকা হলেও জহুরা জেসমিনের সাথে বেশ সখ্যতা ছিল তার। সততা ও সৎ স্বভাবের জন্যে সে ভালোবাসতো জহুরা জেসমিনকে। সেই জহুরা জেসমিনের এত বড়

বইঘর.কম ও রোকন

একটা সর্বনাশের কথা শুনে সে শিউরে উঠলো মনে মনে। ঐ পিকনিক থেকে ফিরে আসার পথেই জরিনা হক জহুরাকে মানিক বাবুর কুমতলব ও দুরভিসন্ধির সকল কথা এক এক করে শোনালো। এরপর বললো, হায়-হায়-হায়! মানিক বাবুর মতো এত বড় একটা মূর্তিমান শয়তানকে তোমার আব্বা জামাই আদরে পালন করছেন বাড়িতে! এমন একটা জঘন্য ধড়িবাজ ও প্রতারকের দুবভিসন্ধির কথা কিছুই জানতে পারেননি তিনি?

জহুরা জেসমিন আফসোস্ করে বললো, তাহলেই বোঝ, আমি কেমন বিপদের মধ্যে আছি এখন। মানিক বাবুর কুমতলবের আভাস আমি অনেক আগেই পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি, মস্ত বড় একটা বদ মতলব নিয়েই সে আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকেছে। কিন্তু আমার আব্বা আম্মাদের কিছুতেই এ কথা বুঝাতে পারছিনে আমি। যদি পারো খবরটা তুমি সত্বর আমার আব্বা-আম্মার কানে পৌঁছাও।

জরিনা হক বিপুল আগ্রহে বললো, পৌঁছাবো, পৌঁছাবো, এখান থেকে ফিরে গিয়ে আজকেই এক ফাঁকে এই দুরভিসন্ধির কথা তোমার আব্বাকে জানাবো।

সত্যি সত্যিই জরিনা হক মানিক বাবুর এই কুমতলবের কথা জহুরা জেসমিনের আব্বাকে সেই দিন সন্ধ্যারাতেই জানিয়ে গেল। কিন্তু তাতে ফল কিছু হলো না।

তাঁর সাধের মানিক বাবুর বিরুদ্ধে কথা বলায় মীর সাহেব বরং অনেকখানি নাখোশই হলেন জরিনা হকের ওপর।

পিকনিক থেকে ফিরে আসতে বেশ খানিকটা রাত হলো মানিক বাবুর। সে কারণে হৈ চৈ করার কোন সুযোগ না পেয়ে সে রাতটা তিনি চুপ করে কাটালেন। কিন্তু পরের দিন সকাল হতেই অন্দর মহলে এসে তিনি জুড়ে দিলেন হৈ চৈ। সালাউদ্দীনকে তাঁর ক্রোধের কেন্দ্র বিন্দু করে মানিক বাবু মীর সাহেবকে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, তাড়িয়ে দিন, আপনাদের ঐ মাস্টারকে এখনই তাড়িয়ে দিন বাড়ি থেকে। পিকনিকে গিয়ে সে আমাকে যারপরনাই অপমানিত করেছে। তার উস্কানিতে আপনার মেয়েও আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে যথেষ্টই। শিগ্গির শিগ্গির বিদায় করুন ঐ শয়তান আর মতলববাজ মাস্টারকে, নইলে ও আপনার মেয়েকে অচিরেই বিপথগামী করবে।

মানিক বাবুর অভিযোগ শুনে মীর সাহেব তখনই বাড়ির এক চাকরকে সামনে পেয়ে বললেন, যাও তো, ডেকে আনো তো ঐ মাস্টারটাকে। পিঠে তার কতগুলো পালক গজিয়েছে সেটা একটু দেখি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দিয়ে আমাদের বোকা বানাতে চায়? জলদি যাও, ডেকে আনো মাস্টারটাকে।

জবাবে চাকরটা বললো, তার তো ওঠার শক্তি নেই হুজুর? ভীষণ জ্বর নিয়ে উনি কাল পিকনিক থেকে ফিরে এসেছেন আর এখনো উনি তাঁর ঘরে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর ঘর ঝাড় দিতে গিয়ে দেখে এলাম।

মীর সাহেব বললেন, জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে?

চাকরটা বললো, জি হুজুর। শুনলাম, সারা বেলা নাকি রোদের মধ্যে বসে ছিলেন। সে রোদ তার সহ্য হয়নি। প্রচণ্ড জ্বর উঠেছে গায়ে তাঁর।

শুনেই লাফিয়ে উঠলেন মানিক বাবু। বললেন, ওরে বাপ্‌রে! দূর করে দিন। এখনই তাকে বিদায় করুন বাড়ি থেকে, নইলে রেহাই পাবেন না কেউ আপনারা।

মীর সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, রেহাই পাবো না কেমন?

বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেন সবাই আপনারা। আমি এখানে থাকলে মারা যাবো আমিও।

সে কি!

অবাক হবার কিছু নেই। চারদিকে বসন্তের দোর্দণ্ড প্রকোপ দেখা দিয়েছে। যার গায়ে জ্বর উঠছে তার গায়েই বসন্তের গুটি ফুটে বেরুচ্ছে আর মারা যাচ্ছে দরাদ্দর। আমি ডাক্তার মানুষ। ঐ মাস্টারের লাল টকটকে মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি বসন্ত ভর করেছে তার ওপর। আজকের দিনের মধ্যেই ওর সমস্ত গা ছেয়ে যাবে বসন্তের গুটিতে।

বলো কি!

দূর করে দিন। যদি সবাই আপনারা বাঁচতে চান, ঐ আপদটাকে এখনই বাড়ি থেকে দূর করে দিন। দেরী করবেন না এক দণ্ড!

এই সময় চাকর কদম আলী এসে মীর সাহেবকে বললো, হুজুর, দু'তিনজন ভদ্রলোক এসে খুবই হন্তদন্তভাবে খোঁজ করছে আপনার। শিগ্গির একটু বাহির বাড়িতে আসুন।

শুনে মীর সাহেব তখনই বাহির বাড়িতে এলেন। এসে দেখলেন, তিনজন ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন তাঁর আগমন পথের দিকে।

বইঘর.কম ও রোকন

তিনজনই প্রৌঢ় লোক। মীর সাহেব তাঁদের সামনে এগিয়ে আসতেই ঐ তিনজনের একজন ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এটা কি মীর আফছার উদ্দীন সাহেবের বাড়ি? মানে আপনি কি মীর...! www.boighar.com

মীর সাহেব বললেন, জি, জি, আমিই মীর আফছার উদ্দীন।

আগন্তুকেরা তিনজনই সালাম দিলেন এক সাথে। সালামের জবাব দিয়ে মীর সাহেব বললেন, ব্যাপার কি বলুন তো? আপনারা...?

ঐ প্রথমজন ফের বললেন, আমরা একটা খবর পেয়ে আপনার এখানে এসেছি। মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবু নামের কোন লোক কি আপনার বাড়িতে আছে?

মীর সাহেব বললেন, জি, আছে।

আছে? তাহলে তাকে একটু এখনই ডাকুন তো। খুবই দরকার।

মীর সাহেবের সাথে কদম আলীও বাহির বাড়িতে এসেছিল। তাকে লক্ষ করে মীর সাহেব বললেন, মানিক বাবাজীকে ডেকে আনো তো, জলদি!

কদম আলী ফের অন্দর মহলে ছুটলো। আগন্তুকদের লক্ষ করে মীর সাহেব প্রশ্ন করলেন, মমতাজ উদ্দীন মানিক বাবাজীকে কি প্রয়োজন আপনাদের?

প্রথমজন বললেন, প্রয়োজনটা ও এলেই জানতে পারবেন।

অত:পর তিনি স্বগতোক্তি করলেন, বাবাজী! বাবাজীই বটে!

ইতিমধ্যেই কদম আলীর সাথে মানিক বাবু বাহির বাড়িতে এলেন। এসে ঐ তিনজন আগন্তুকের দিকে চোখ তুলে চেয়েই বাঘ দেখারও অধিক চম্‌কে উঠলেন মানিক বাবু। 'ওরে বাপরে' বলে লাফিয়ে উঠে তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগলেন।

তা দেখে আগন্তুকেরা তিনজনই ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল। ধরুন, ওকে ধরুন...!

মীর সাহেব থতমত করে বললেন, ধরবো? কেন?

প্রথমজন বললেন, ধরুন, ধরুন, আপনার লোকজন দিয়ে ওকে আটকান।

আটকাবো? ব্যাপারটা কি?

বলছি, বলছি, ব্যাপারটা বলছি। আগে ওকে ধরার ব্যবস্থা করুন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু কে কাকে ধরে তখন! এদের এই কথা কাটাকাটির ফাঁকে, পড়ি মরি লাফের ওপর লাফ দিয়ে শ্রীমান মমতাজ উদ্দীন মানিক অদৃশ্য হয়ে গেল।

আগন্তুকদের দ্বিতীয়জন বললেন, যা! হারামজাদাটা আবার পালিয়ে গেল! আমরা বৃদ্ধ মানুষ। আটকানোর কেউ না থাকায় প্রতারকটা আবার পালিয়ে গেল!

মীর সাহেবের দুচোখ বিস্ফারিত হলো। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, প্রতারক! সেকি?

প্রথমজন বললেন, প্রতারক, মহাপ্রতারক, মূর্তিমান শয়তান! আদর করে ওকে অন্দর মহলে স্থান দিয়েছেন আপনি! ঘরে তুলে জামাই আদরে খাওয়াচ্ছেন?

অর্থাৎ?

আমাদের মতো বিভ্রান্ত হয়েছেন আপনিও?

বিভ্রান্ত হয়েছি!

চরম বিভ্রান্ত হয়েছেন। বিপুল ধন-সম্পদের একমাত্র ওয়ারিশ জেনে আপনার মতো বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরাও। বদমায়েশটাকে জামাই বানানোর জন্যে আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আজ তার খেসারত দিচ্ছি গুণে গুণে।

কি রকম! কি রকম?

সাত লাখ টাকা যৌতুক দিয়ে আমার পরমা সুন্দরী মেয়েকে শাদি দিই ওর সাথে। টাকাটা গুণে নিয়ে শাদিটা সে করে বটে, কিন্তু তার পরেই চম্পট দিয়েছে। আমার মেয়েকে সে গ্রহণ করেনি।

গ্রহণ করেনি?

জি না। মেয়েকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়নি কোনদিনই। শাদির পরে আমার বাড়িতেও সে আর আসেনি কখনো। এখন শুনছি, সে শাদি করেছে আরো কয়েকটা আর তালাক দেবে আমার মেয়েকে।

বলেন কি! বলেন কি!

দ্বিতীয়জন বললেন, বলাবলির আর কি আছে ভাই সাহেব? লোভনীয় বর মনে করে উনার মতোই পাগল হই আমিও। অত:পর পাঁচ লাখ টাকা যৌতুক দিয়ে ওর সাথে শাদি দিই আমার মেয়ের। কিন্তু প্রতারকটা আমার সাথে চরম প্রতারণা করেছে।

প্রথমজনের প্রতি ইংগিত করে দ্বিতীয়জন ফের বললেন, এই ভাই সাহেবের মেয়েকে তো তালাক দেবো দেবো করছে। কিন্তু আমার

মেয়েকে তালাক দিয়েই ফেলেছে ঠগ্‌টা। টাকাটা গুণে নিয়ে বাড়িতে গিয়েই তালাক দিয়েছে আমার মেয়েকে।

মীর সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল! বললেন, কী তাজ্জব! কী তাজ্জব! এও সম্ভব?

আগন্তুকদের তৃতীয়জন বললো, সম্ভবের দেখেছেন কি মীর সাহেব? আমার মেয়েকে শাদি করার ওয়াদা করে আমার নিকট থেকে ঐ ঠগটা তিন লাখ টাকা অগ্রিম গুণে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বেশি জানাজানি হয়ে গেলে বরটা ফস্‌কে যাবে, অন্য কেউ নিয়ে নেবে বরটাকে, এই বিবেচনায় অনেকটা গোপনেই দিয়ে দিই ঐ তিন লাখ টাকা। টাকাটা নিয়ে সেই যে হাওয়া হয়ে গেছে আর সে ধরা দেয়নি কখনো।

কী গজব! আপনারা তিন তিনজন লোক এক সাথে ঠকলেন।

প্রথমজন বললো, না না, এক সাথে নয়। এর আগে আমরা কেউ কাউকে চিনতামও না। এক একজন আমরা এক এক সময় ঐ শয়তানটার খপ্পরে পড়ি। বিয়ে দেয়ার পরে আর কেউ আমরা কখনই ধরতে পারিনি তাকে। তার খোঁজে বেরিয়েই ইনাদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে আমার। আমার মতোই ঐ শয়তানটার খোঁজ করতে বেরিয়েছেন ইনারাও।

প্রথমজন তাঁর সঙ্গী অপর দুইজনের প্রতি ইংগিত করলেন। মীর সাহেব বললেন, তো এভাবে খোঁজ করছেন কেন? তার বাড়িতে যাবেন।

গিয়েছি, গিয়েছি। গিয়ে দেখি ইট পুড়িয়ে পুড়িয়ে অনেক টাকার মালিক হয়েছেন ঐ শয়তানটার তথাকথিত বাপ। সেই বাপের সাথে ছেলের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ ধন-সম্পদের কোন ওয়ারিশও ঐ শয়তানটা নয়। ওয়ারিশ বাপের নিজের ছেলেরা।

সেকি! সেকি!

ঐ ধন-সম্পদের ভবিষ্যত মালিক হিসাবে নিজেকে জাহির করে শয়তানটা একের পর এক লোকজনকে প্রলুব্ধ করছে আর তার মেয়েকে শাদি করার প্রহসন করে গাদা গাদা টাকা হাতড়িয়ে নিচ্ছে।

মীর সাহেব দম বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, ঐ মমতাজউদ্দীন মানিক তার বাপের ধন-সম্পদের মালিক নয়, কি রকম?

প্রথমজন বললেন, ঐ বাপের ছেলেই সে তো নয়! তার বাপ অন্যজন। অন্যজনের ঔরষজাত ঐ ছেলেকে হাতে নিয়ে এসে তার বিধবা মা ফের নিকাহ করেন ঐ বিত্তবানের সাথে। ঐ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বেঈমানটা যে

বইঘর.কম ও রোকন

আরো কতজনের কী সর্বনাশ করেছে কে জানে? তার খোঁজে বেরিয়ে জানলাম, ঐ প্রবঞ্চকটা এখন আপনার বাড়িতে আছে। মানে, আপনিও তার খপ্পরে পড়েছেন।

জরিনা হকের হুঁশিয়ারীটা এতক্ষণে স্মরণে এলো মীর সাহেবের। সেটা স্মরণ আসতেই তিনি শিউরে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! আপনারা না এলে তো আমারও মাথায় বাড়ি হয়ে যেতো আপনাদের মতো।

যেতোই তো। এইটেই তো ঐ ঠগের এখন একমাত্র পেশা। এই রকম ঠগ্‌বাজি করেই প্রভূত অর্থ কামাই করছে। তা থাক সে কথা। ধরেও যখন ধরতে পারলাম না শয়তানটাকে, তখন আর এখানে দেরী করা অর্থহীন। আমরা যাই।

মীর সাহেব হুঁশে এসে বললেন, আরে যাবেন কি! আসুন, আপনারা এসে আমার এই বৈঠকখানায় বসুন। এ বেলাটা এখানে আহার বিশ্রাম করে ও বেলায় যাবেন।

প্রথমজন বললেন, না, না, আমাদের দেরী করার মওকা নেই। রাস্তাতেই আমরা স্থির করেছি আপনার এখানে এসে শয়তানটাকে পাই না পাই, এভাবেই কোর্টে যাবো আমরা। কোর্টের আশ্রয় না নিলে ঐ প্রতারককে শায়েস্তা করা যাবে না।

বলেই প্রথমজন তার সঙ্গী অপর দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চলুন, চলুন, দেরী করলে আজ কোর্ট ধরা যাবে না।

রওনা হলেন তারা। মীর সাহেবের আন্তরিক আমন্ত্রণ সত্ত্বেও চলে গেলেন আগন্তুকেরা। বাহির বাড়িতে কি ঘটছে তা দেখার জন্যে অন্দর মহলের সবাই এসে জড়ো হয়েছিলেন বাহির বাড়িতে আসার ঐ করিডোরের মুখে। মীর সাহেবের বিবি সাহেবা ঘটনাটা শোনা অবধি থর থর করে কাঁপছিলেন। আগন্তুকেরা চলে গেলে তিনি মীর সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাঁচিয়েছেন, মস্ত বড় সর্বনাশ থেকে আল্লাহতায়ালা বাঁচিয়েছেন আমাদের! আপনি এখন আসুন, বাড়ির ভেতরে আসুন। এই মাত্র আমাদের জামাল মিয়া আর একটা যে খবর এনেছে, ভেতরে এসে সেটা শুনুন।

উৎকর্ণ হয়ে মীর সাহেব বললেন, আর একটা খবর! কি সে খবর?

বইঘর.কম ও রোকন

মীর সাহেবের বিবি সাহেবা বললেন, ভেতরে এসে আগে স্থির হয়ে বসুন। তারপর বলছি সব।

ভেতরে এসে স্থির হয়ে বসলেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করলেন, কি খবর, বলো?

বিবি সাহেবা বললেন, খবরটা বলার আগে একটা কথা বলে রাখি। আর কোন অজানা অচেনা মানুষকে বাড়িতে রাখবো না। কে কোন্ মতলব নিয়ে এসে এই বাড়িতে ঢুকেছে তার ঠিক কি? আক্কেল আমাদের হয়ে গেছে। এবার ঐ মাস্টারটাকেও শিগ্গিরই বিদায় করতে হবে, তা বলে রাখছি।

তা সে দেখা যাবে। কিন্তু খবরটা কি তাই আগে শুনি।

খবরটা হলো, আমাদের হানিফ স্যারের মামাতো ভাই মোজাম্মেল হককে তো চেনেন। ইউনিভার্সিটিতে কেরানীর চাকরী করেন। তিনি গতকাল ঐ হানিফ স্যারের বাড়িতে এসেছেন। তিনি এসেছেন বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে।

উদ্দেশ্য! কি উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্যটাতে কোনই গুরুত্ব দেইনি একটু আগে। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে যে সেইটেই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে আমাদের জন্যে, তা কে জানতো?

অর্থাৎ?

বিষয়টা হচ্ছে আমাদের জহুরা জেসমিনের শাদির। ঐ ইউনিভার্সিটিতে কে একজন সৎ, সুদর্শন আর তরুণ অধ্যাপক আছেন। খুবই নাম করা অধ্যাপক। তিনি গ্রামাঞ্চলের সৎ, সেকেলে আর পরহেজগার মেয়েকে শাদি করতে ইচ্ছুক। এমন মেয়ে না পেলে তিনি কখনই শাদি করবেন না। তাই মোজাম্মেল হক সাহেবের মনে হয়েছে, আমাদের জহুরা জেসমিনকে দেখালে নিশ্চয়ই ঐ অধ্যাপকের পছন্দ হবে। আমরা যদি চাই, তাহলে মোজাম্মেল হক সাহেব এ নিয়ে ঐ তরুণ অধ্যাপকের সাথে কথা বলতে আগ্রহী।

বেশ তো! তা যদি মোজাম্মেল হক বলে তাহলে তো আমাদের উপকারই হয় যথেষ্ট। হঠাৎ করে কি দিয়ে কি ঘটে গেল, মেয়েটাকে নিয়ে ফের চরম সমস্যায় পড়ে গেলাম।

সেই কথাই তো বলছি।

বইঘর.কম ও রোকন

ডাকো, কাউকে দিয়ে মোজাম্মেল হককে ডেকে আনো। আমার তো কষ্ট হবে ওখানে যেতে। মোজাম্মেল হক আসুক। আমাদের জামাল মিয়া কি শুনতে কি শুনেছে, মোজাম্মেল হকের মুখেই শুনি সে কথাটা।

বিবি সাহেবা তখনই মোজাম্মেল হক সাহেবকে অনুরোধ করে এ বাড়িতে আনার জন্যে কদম আলীকে পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই মোজাম্মেল হককে সাথে নিয়ে ফিরে এলো কদম আলী। মীর সাহেব আর তাঁর বিবি সাহেবা মোজাম্মেল হককে নিয়ে খোলা বারান্দায় বসলেন। কথাবার্তা একটু এগুতেই জহুরা জেসমিনের আহ্বানে সালাউদ্দীন আহমদ তাঁদের সামনে দিয়ে জহুরা জেসমিনের কক্ষের দিকে যাচ্ছিল। জ্বরটা তার পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে সালাউদ্দীন তাঁদের সামনে দিয়ে যেতেই তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন মোজাম্মেল হক। 'কে, কে?' বলে তিনি উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন। সালাউদ্দীন নত মস্তকে সামনের দিকে নজর রেখে চলছিল। মোজাম্মেল হকের ডাকে সে মাথা তুলে ঘুরে তাকাতেই মোজাম্মেল হক সাহেব একদম অন্য মানুষ বনে গেলেন, 'কী তাজ্জব!'

বলে চীৎকার দিয়ে উঠে তিনি লাফ দিয়ে নেমে এলেন বারান্দা থেকে এবং সালাউদ্দীনের কাছে এসে বিপুল বিস্ময়ে বললেন, এ কি স্যার, আপনি? আপনি এখানে? এ কি অসম্ভব ব্যাপার! এ কি তাজ্জব ব্যাপার!

আনন্দে ও বিস্ময়ে মোজাম্মেল হক সাহেব লাফালাফি করতে লাগলেন। তাঁর চীৎকার ও লাফালাফিতে জহুরা জেসমিনসহ বাড়ির অন্যান্য সকলেই ছুটে এসে জড়ো হলো অন্দর মহলের আঙিনায়। মীর সাহেব ফের যারপরনাই বিস্মিত হলেন। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, সেকি হক সাহেব, আপনি একে চেনেন?

মোজাম্মেল হক প্রবল কণ্ঠে বললেন, চিনি মানে কি দুলা ভাই? ইনিই আমাদের ভার্সিটির সেই তরুণ অধ্যাপক। ইনার কথাই তো বলতে এসেছি আমি।

সে কেমন কথা! ভালো করে চিনতে পারছেন তো? এ ছেলে কিন্তু আমাদের গৃহশিক্ষক সালাউদ্দীন।

জি, জি। চিনতে পারবো না মানে? এ কি দুই একদিনের পরিচয়? উনাদের ডিপার্টমেন্টেরই অফিস সহকারী আমি।

বলেন কি!

জি, জি! ইনি আপনাদের গৃহশিক্ষক! এ কি কথা বলছেন?

বলেই মোজাম্মেল হক সালাউদ্দীনকে প্রশ্ন করলেন, সেকি স্যার? এ কি শুনছি আমি?

ধরা পড়ে যাওয়ায় নিজেকে আর লুকানোর চেষ্টা করলো না সালাউদ্দীন। মাথা নীচু করে নীচু গলায় বললো, হ্যাঁ, হক সাহেব, আপনি ঠিকই শুনছেন। আমি এক্ষণে গৃহশিক্ষক হয়েই এ বাড়িতে আছি।

মোজাম্মেল হক সাহেব একই রকম বিস্মিত কণ্ঠে ফের প্রশ্ন করলেন, নিজের পরিচয় গোপন করে?

www.boighar.com

আরো খানিক লজ্জিত হলো সালাউদ্দীন। লজ্জিত কণ্ঠে বললো, জি, জি, সম্পূর্ণ গোপন করে।

কী আশ্চর্য! আপনার মতো এত বড় একজন সৎ মানুষ এভাবে আত্মপরিচয় গোপন করে গেলেন? এত বড় গুনাহের কাজ করলেন?

হ্যাঁ, হক সাহেব, একথা আমি অস্বীকার করবো না। ইচ্ছে করেই আমি এই গুনাহের কাজ করেছি আর গুনাহ্গার হয়েছি। এজন্যে আপনারা আমাকে যত খুশি তিরস্কার করতে পারেন, আমি কিছু বলবো না।

তা আপনি না বলেন! কিন্তু ইচ্ছে করে আপনি এমন একটা গুনাহ্গার হতে গেলেন কেন, তা আমি ভেবেই পাচ্ছিনে। আপনার মতো একজন পরহেজগার লোক পরকালটা এভাবে বিপদগ্রস্ত করে ফেললেন কি কারণে, তা আমার মাথাতেই আসছে না।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জহুরা জেসমিন। এবার সে চীৎকার করে বলে উঠলো, প্রতারক! মহাপ্রতারক! আমরা আর একটা প্রতারকের খপ্পরে পড়েছি। তাড়িয়ে দিন আব্বাজান, এই বেঈমানটাকেও এখনই তাড়িয়ে দিন বাড়ি থেকে।

বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠলো জহুরা জেসমিন।

জামাল মিয়া হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল জহুরা জেসমিনের পাশেই। সে এবার আফসোসের সুরে বললো, হায় আল্লাহ! এ দুনিয়াডায় কি আর কাউকেই বিশ্বাস করণ যাইবো না! মস্ত বড় ঈমানদার আর আলেম লোক ভাইবা যার পেছনে নামাজ পড়লাম এতদিন, হে লোকটা এত বড় এক গুনাহ্গার! কী গজব! নামাজগুলো আমাগোর তাইলে পানিতেই পইড়া গেল!

কান্নাজড়িত কণ্ঠে জহুরা জেসমিন আবার বললো, বের করে দাও জামাল চাচা, এই মিথ্যাবাদীটাকে এখনই বের করে দাও বাড়ি থেকে।

এত বড় প্রতারণা যে করতে পারে, তাকে আর আমার এক বিন্দু বিশ্বাস নেই। যে কোন সময় যে কোন প্রতারণা করে বসবে সে। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও ওকে।

আবার দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জহুরা জেসমিন। সেটা লক্ষ করে সালাউদ্দীন বললো, তাড়িয়ে দিতে হবে না। কেন আমি ইচ্ছে করেই এমন গুনাহ্‌গার হতে গেলাম, সে কাহিনীটা বলার সুযোগ দিলে তা বলেই আমি আপসে আপ্‌ চলে যাবো এই বাড়ি থেকে। এর পর আর এ বাড়িতে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

জহুরা জেসমিন ফুঁসে ওঠে বললো, কাহিনী?

সালাউদ্দীন স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, জি, কাহিনী। আমি নিজে মিথ্যা বললাম, আপনাদের লোকাল থানার ও.সি.-কে দিয়ে মিথ্যা বলিয়ে নিলাম, এতগুলো মিথ্যার পেছনে কোন একটা কাহিনী থাকতেই তো পারে জরুর।

মীর সাহেবসহ আরো কয়েকজন এক সাথে বলে উঠলেন, তাহলে কী সে কাহিনী, শোনাও দেখি?

সালাউদ্দীন দুর্বল কণ্ঠে বললো, গায়ে আমার জ্বর। তা খানিকটা কমে গেলেও জ্বরটা পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি। অনুমতি দিলে ঐ বারান্দায় বসে কাহিনীটা বলি, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে।

মীর সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ! এসো এখানে। আমার পাশে বসেই তোমার যা বলার সব বলো। মীর সাহেবের পাশে বসে একটু দম নিলো সালাউদ্দীন। এরপরে শুরু করলো কাহিনী।

৬

বলে যাচ্ছে সালাউদ্দীন

ভাড়াটে নৌকায় চড়ে নদীর উজানে ছুটছি ট্রেন ধরার জন্য। গুদাম ছইয়ের বেশ বড়ো-সড়ো নৌকা। নৌকাটা আমার রিজার্ভ করা হেতু নৌকাতে একাই আছি আমি। স্টেশানটা নদীর উজানে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে আর এই নদীর তীরেই অবস্থিত। ট্রেনের টাইম এগিয়ে আসছে

ক্রমেই। ছইয়ের মধ্যে বসে তাই মাঝিকে তাড়া দিচ্ছি জোরে জোরে নৌকা চালানোর জন্যে। নদীর একদম পাড় ঘেঁষে লগি দিয়ে নৌকা ঠেলছে মাঝি। নদীতে ভীষণ স্রোত। মাঝ নদীতে একা একা বৈঠা মেরে উজানে যাওয়া দুষ্কর। এ কারণেই নদীর কিনার বেয়ে লগির সাহায্যে নৌকা ঠেলছে মাঝিটা।

নদীর দুই পাড়েই লোক বসতি। ছোট বড় অনেক গাঁ। প্রতিটি গাঁয়ের সামনে একাধিক ঘাট। কোনটা জনাকীর্ণ, কোনটা জনশূন্য। এমনই এক জনশূন্য ঘাটের পাশ দিয়ে নৌকাটা আমার যেতেই একটা ব্যস্ত কণ্ঠের আওয়াজ এলো, ও মাঝি, নৌকা ভেড়াও! নৌকা পাড়ে ভেড়াও। আমরা স্টেশানে যাবো।

মাঝি উত্তর দিলো, ভেড়ানো যাবে না, নৌকায় লোক আছে।

ফের আওয়াজ এলো, লোক আছে? ক'জন?

একজন।

তাহলে আর অসুবিধা কি? আমাদেরও নাও। ভাড়া যা চাও, তাই দেবো।

তা দিলেও আপনাদের নিতে পারবো না। এ নৌকা রিজার্ভ করা নৌকা।

রিজার্ভ করা? কিন্তু আমাদের যে যেতেই হবে! এই ট্রেনটাই ধরতে হবে। নদীতে আর একখানাও ভাড়াটে নৌকা দেখা যাচ্ছে না। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি নৌকার অপেক্ষায়! ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। দেখি, ঘাটের নীচে নেমে এসে কথা বলছেন একজন প্রৌঢ় লোক। বয়স পঞ্চাশ-ষাটের মধ্যে। পরনে ছিমছাম পোশাক। হাতে একটা মাঝারী সাইজের চামড়ার সুটকেস। তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক উদীয়মানা যুবতী। পরনে অতি আধুনিক লেবাস। চেহারাটা আকর্ষণীয়।

আমি ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোকটি অনুনয় করে বললেন, এই যে বাবাজী, আপনারই বুঝি রিজার্ভ করা নৌকা এটা? আমাদের একটু নৌকাতে নাও বাবাজী। এই ট্রেনটা ধরতেই হবে আমাদের, নইলে ট্রেন আবার সেই রাতে। একটু মেহেরবানী করো বাবাজী!

ভদ্রলোকের আকুতি দেখে আমি মাঝিকে বললাম, নাও তীরে ভেড়াও মাঝি। ওনাদের তুলে নাও নায়ে।

মাঝিটা ইতস্তত করে বললো, তুলে নেবো?

বললাম, হ্যাঁ, নাও।

ঘাট ছেড়ে নৌকাটা তখন কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। নৌকা ঘুরিয়ে এনে ঘাটে ভেড়ালে খুবই খুশি হয়ে নৌকায় উঠে পড়লেন যুবতীটিসহ ভদ্রলোকটি। মুখে তাঁর কৃতজ্ঞতার অফুরন্ত বাণী।

পুনরায় ছেড়ে দিলো নৌকা। মেয়েটাসহ ভদ্রলোক গিয়ে ছইয়ের মধ্যে বসলেন। আমি ছইয়ের মধ্যে যাবো কিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেই ভদ্রলোকটি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, ওহো, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো ছইয়ের মধ্যে বসো।

আমি ইতস্তত করে বললাম, না।

ভদ্রলোকটি নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন, বাইরে বসার কোন জায়গা নেই বলেই আমরা ছইয়ের ভেতরে এসে বসেছি। তোমার আপত্তি থাকলে...!

আমি অপ্রতিভ হলেম। ভদ্রলোকের এ কথায় আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আরে না না, আমার আপত্তি থাকবে কেন? আপনারা থাকুন ওখানে। আমিও ছইয়ের ভেতরে এসে বসছি...।

আমি গিয়ে ছইয়ের মধ্যে বসলাম। খুশি হলেন ভদ্রলোক। খোশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তা এই নৌকা পথে কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবাজী?

বললাম, ইস্টিশানে। আমিও এই ট্রেনটাই ধরবো।

খুশিতে ফুলে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, মারহাবা, মারহাবা! ট্রেন ধরে কোথায় যাবে বাবাজী?

বললাম, জেলা সদরে।

আবার ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, কেয়া বাত! আমরাও ঐ জেলা সদরেই যাবো, মানে আমার এই মেয়ে যাবে। কী অপূর্ব যোগাযোগ! তা তোমার...!

বলেই থেমে গেলেন ভদ্রলোক। অপরাধীর কণ্ঠে বললেন, ওহো, সেই থেকেই আপনাকে শুধু 'তুমি, তুমি' করে যাচ্ছি। তুমি তো এতে নারাজ-নাখোশ...!

কথা তাকে শেষ করতে না দিয়ে বললাম, নারাজ-নাখোশ...! কি বলছেন? আমি এতে যথেষ্ট খুশিই হয়েছি। আপনি আমার বাপ বয়সী মানুষ। আপনি আমাকে 'আপনি, আপনি' করলে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতাম আমি!

বেশ বাবা, বেশ বেশ। ঐ জেলা সদরে কাজটা কি তোমার বাপজান?

আমি ওখানে সরকারী কলেজে আই.এ. পড়ি।

আর এক দফা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, কী তাজ্জব! আমার এই মেয়েও ঐ সরকারী কলেজের পাশেই গার্লস্ স্কুলে পড়ে। বললাম, এটা বুঝি আপনার মেয়ে? বললেন, জি বাবা, জি।

কি নাম?

চেমন আরা শ্রীমতি।

শ্রীমতি! সেকি! চেমন আরা নামটাই তো বেশ নাম। এর সাথে আবার শ্রীমতি কেন?

অল্প হেসে ভদ্রলোক বললেন, জানো তো বাবা, আধুনিক যুগ এটা। আসল নামটা কি আর ঠিক রাখে কেউ এখন?

অর্থাৎ?

চেমন আরা নামটা নাকি একেবারেই সেকেলে। এই আধুনিক যুগে আধুনিক হওয়ার জন্যেই তাই ঐ শ্রীমতি নামটা যোগ করে নিয়েছে।

বটে!

চেমন আরার আধুনিক আত্মীয়ারাই ঐ নামটা আসল নামের সাথে জুড়ে দিয়ে নামটাকে ওরা আধুনিক করে দিয়েছে।

বাধা দেননি আপনি?

তা দিলেই বা শুনছে কে? এসব ব্যাপারে আমাদের আপত্তির কি আর কোন দাম আছে এখন?

কিন্তু তাই বলে একেবারেই ঐ অনৈসলামী নাম? 'শ্রীমতি, 'শ্রীযুক্ত' এগুলো তো ভিন্ন ধর্মের নাম আর ভিন্ন ধর্মের পরিভাষা।

কি আর এমন ভিন্ন ধর্মের বাপজান! শ্রীতে মতি যার, সেই তো শ্রীমতি। আমাদের বাংলা ভাষার পরিভাষা আর আমাদের বাঙালি নাম।

শুনে আমি নীরব হয়ে গেলাম। কোন কথা বলারই আর ইচ্ছে রইলো না আমার। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে নীরব থাকতে দিলেন না। তিনি এবার আমার নাম পরিচয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটা কি বাপজান?

বললাম, সালাউদ্দীন আহমদ।

বাড়ি? মানে নদীর ঐ বাটির কোথা থেকে আসছিলে?

আমার গ্রাম ইউসুফপুর থেকে। নদী থেকে মাইল দেড়েক দক্ষিণে আমার গ্রাম। একটা মরা নদীর ধারে। পায়ে হেঁটে এই বড় নদীর কাছে আসতে হয়। ইউসুফপুর থেকে ইস্টিশানে যাওয়ার বড় নদীর এই নৌকা পথটাই একমাত্র সহজ পথ।

ভদ্রলোক চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, তোমার গ্রামের নাম ইউসুফপুর?

জি, জি, ইউসুফপুর। ছোট একটা গ্রাম।

ও আচ্ছা। বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

কেউ নেই।

কেউ নেই? সে কেমন কথা? তোমার বাপ-মা, ভাই-বোন—এঁরা কেউ নেই?

না। আব্বা-আম্মা মারা গেছেন অনেক আগেই। ভাই বোন দুজন। অল্প দিন হলো মারা গেছেন তাঁরাও।

আহারে, বড়ই দুঃখের ব্যাপার! তাহলে গাঁয়ে তুমি থাকো কোথায়?

আমার বাড়ির লাগালাগি এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

নিজের বাড়ি আছে তাহলে?

আছে। মস্ত বড় এক দালান বাড়ি আছে আমার। মস্ত বড় এলাকা জুড়ে বাড়ি। সে বাড়িতে শুধুই ধুলো জমছে এখন। একা একা তো থাকতে পারিনে অত বড় বাড়িতে।

সচকিত হয়ে উঠে ভদ্রলোক বললেন, দালান বাড়ি? বলো কি! তাহলে জমিজমাও আছে বুঝি অনেক!

জি, জি, অনেক। ওগুলোই হয়েছে আমার এক ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট। আমি থাকি পড়াশোনা নিয়ে। ওগুলো দেখার আমার সময় কোথায়?

তাহলে কে দেখে এখন?

আমার ঐ আত্মীয়টা। ও-ই এখন সব ভোগ করে। খাজনা-পাতি শোধ করে আমাকে যা দেয়, সেইটেই আমার জন্যে ঢের।

তাজ্জব!

ভদ্রলোক থামলেন। কিছুক্ষণ চুপ করেও রইলেন। কিন্তু এরপরেই আবার সোচ্চার হয়ে উঠলেন তিনি। সোচ্চার কণ্ঠে বললেন, ও হ্যাঁ, তোমাদের ঐ ইউসুফপুর গাঁয়ের না তোমাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কোন এক গাঁয়ের এক ছেলে ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করেছিল এই বছর দুই আগে। তাকে চেনো কি?

অর্থাৎ?

ম্যাট্রিকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছিল। খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, ও ছেলেকে গাঁয়ে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। সে এখন শহরে থাকে।

তার খোঁজ নিতে চেয়েছিলেন আপনি? কেন বলুন তো?

কেন আবার? যাদের ঘরে মেয়ে আছে, এমন ছেলের খোঁজ তারা তো নেবেই।

লজ্জা পেলাম আমি। মাথা নীচু করে চুপ করে রইলাম। কিন্তু হাল ছাড়লেন না ভদ্রলোক। ফের প্রশ্ন করলেন, চেনো ঐ ছেলেকে?

নত মস্তকে বললাম, চিনি।

ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বললেন, চেনো? কোথায় থাকে সে? কোন্ গাঁয়ে বাড়ি?

জি, আমিই সেই ছেলে। গত বছরের আগের বছর আমিই ম্যাট্রিকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করি। মাত্র দুই নম্বরের জন্যে ফার্স্ট হতে পারিনি।

ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাস এবার দেখে কে? তিনি এক রকম লাফিয়েই উঠলেন ছইয়ের ভেতর। দুচোখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! তুমিই সেই ছেলে?

বলেই তিনি মেয়েকে লক্ষ করে বললেন, শুনলে মা শ্রীমতি? এই সেই ছেলে। এই ছেলেই ম্যাট্রিকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করা সেই ছেলে।

এ যাবত আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল চেমন আরা শ্রীমতি। তন্ময় হয়ে আমাকে দেখছিল। দর্শনধারী বলে ছেলেবেলা থেকেই একটা খ্যাতি ছিল আমার। সে কারণেই সে হয়তো আমার দিকে চেয়েছিল ঐভাবে। এতে করেই সে কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল। বাপের কথায় সজ্ঞানে ফিরে এসে সে কল কণ্ঠে বলে উঠলো, এ্যাঁ? ওহ্ মাই গড্! ইনিই ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করা সেই ছেলে? কী তাজ্জব! কী আশ্চর্য! সেই ছেলেটাই এখন একদম পাশে বসে আমাদের? ও গড্! মর্ যাউংগি, বিলকুল মর্ যাউংগি...!

বলতে বলতে শ্রীমতি কিছুক্ষণ হাতপা ছুঁড়লো। এর পরেই মুখে কাপড় চেপে সিনেমার কায়দায় সে হাসিতে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো আর মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে লাগলো।

এবার ভদ্র লোকটি স্ব-ইচ্ছায় আর গড়গড় করে নিজের বায়োডাটা তুলে ধরতে লাগলেন। বললেন, আমার নাম নজিবর রহমান তালুকদার। আমার গাঁয়ের সবচেয়ে ধনী লোক আমি। মেয়েও আমার এই একটাই।

বইঘর.কম ও রোকন

আর কোন ছেলেমেয়ে নেই আমার। যে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে, বিয়ের সময় তাকে অঢেল টাকা-পয়সা তো দেবোই। এরপরে আমার বিষয়-সম্পত্তি সব আমার মেয়ের মানে তার হয়ে যাবে।

নজিবর সাহেবের এই স্পষ্ট ইংগিতটা বুঝতে পেরে শরমে আমি জড়সড় হয়ে গেলাম। কোনমতে তাঁর কথার হাঁ-না উত্তর দিয়ে কালক্ষেপণ করতে লাগলাম। অবশেষে তিনি বললেন, তোমার সাথে সাক্ষাত হয়ে আমার বড়ই উপকার হলো বাবা। মেয়েটাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি ফিরে আসবো আর মেয়েটা একা একাই জেলা সদরে চলে যাবে, এই পরিকল্পনা নিয়েই বেরিয়েছি আমরা। কিন্তু মেয়েটাকে একা একা পাঠিয়ে অনেকখানি দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতাম। এখন তুমিও যখন ঐ একই জায়গায় যাচ্ছো, মেয়েটাকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমি দুশ্চিন্তামুক্ত হবো বাবা। দয়া করে আমার এই উপকারটুকু করার জন্যে তোমাকে বিশেষ অনুরোধ করছি। বেশি কিছু করতে হবে না। সংগে করে নিয়ে গিয়ে ওর হোস্টেলের গেটে ওকে পৌঁছে দিলেই ব্যস্ আর কিছুই করতে হবে না তোমাকে, পারবে না বাবা, আমাদের এটুকু উপকার করতে?

তা কথা হলো উনি যদি আমার সাথে যান, তাহলে আমার না পারার কি আছে? আমাকে তো বয়ে নিয়ে যেতে হবে না তাকে। উনি বুঝি ওখানে হোস্টেলে থাকেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেয়েদের হোস্টেলে। আমার আরো কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের মেয়ে আছে ওখানে। ওরা এক সাথে থাকে।

তাই নাকি? তা উনি কোন্ ক্লাসে...?

আরে উনি, উনি করছো কেন? ও তোমার বয়সে অনেক ছোট। ওকে 'তুমি' বলবে। তোমার চেয়ে ছোট মেয়েকে 'আপনি, আপনি' করতে দেখলে লোকজন হাসবে যে!

ও আচ্ছা। তা ও কোন্ ক্লাসে ওর হাফ্-ইয়ারলী...

ক্লাস টেনে পড়ে। সামনেই পরীক্ষা। সেজন্যেই মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে। তা বলছিলাম কি বাবাজী, এই উপকারের সাথে আর একটা উপকার করো যদি, মানে এত বড় মেধাবী ছেলে তুমি, মেয়েটাকে আমার মাঝে মধ্যে যদি একটু করে গাইডেন্স দাও, তাহলে তোমার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। মেয়েটাও আমার অনেকখানি মেধাবী। ওকে

বইঘর.কম ও রোকন

টিপ্‌স্ দিতে বড় একটা অসুবিধা হবে না। পারবে কি বাপজান এই উপকারটুকু করতে?

কেন যেন মেয়েটার চেহারা আমারও বেশ ভালো লেগেছিল। তাই নত মস্তকে বললাম, জি। ও ডেকে পাঠালেই পারবো।

মারহাবা! মারহাবা! তোমার কল্যাণ হোক! শুনলে তো মা শ্রীমতি, যখনই কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হবে তখনই এই বাবাজীর সাহায্য নেবে। এ বাবাজী কিন্তু কথা দিলো আমাকে। www.boighar.com

মেয়েটা আক্ষেপের সুরে বললো, কথা তো অনেকেই দেয় ড্যাড্, কিন্তু কথা রাখে ক'জন?

নজিবর রহমান সাহেব বললেন, কি বাপজান, রাখবে না তোমার কথা?

শক্ত কণ্ঠে বললাম, কথা দিলে আমি কথার বরখেলাপ করিনে।

এত সহজে আমার এই কথা দেয়ার একটা কারণ, এই আধুনিকা মেয়েটিকে একটু পর্দা আব্রুর মধ্যে আনা আর খানিকটা হলেও ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়া। বলা যায়, এটাই ছিল বড় উদ্দেশ্য আমার। আমাদের গ্রাম এলাকার একটা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, সৎসঙ্গের অভাবে এভাবে বখে যাবে, এটা যেন কেমন পীড়া দিচ্ছিল আমাকে।

কথায় কথায় ইস্টিশানের ঘাটে আমরা পৌঁছে গেলাম। নৌকা থেকে নামার অল্প একটু পরেই চলে এলো ট্রেন। আমরা উঠে পড়লাম ট্রেনে। চেমন আরা শ্রীমতির ভার আমার ওপর দিয়ে হৃষ্টমনে ফিরে গেলেন নজিবর রহমান তালুকদার।

বাপের সামনে অনেকটা সংযত থাকলেও ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পর সে সংযম ভেংগে গেল চেমন আরা শ্রীমতির। সারা পথ সে আমাকে গানে, গল্পে, আদরে, আপ্যায়নে এমনভাবে আপ্লুত করে তুললো যেন আমি তার অনেক দিনের পরিচিত জন আর আমিই তার জীবনের একমাত্র ভালোবাসার মানুষ! ভালোবাসার জগতে আমারও এই প্রথম পদক্ষেপ হেতু নিজের প্রায় অজান্তেই শ্রীমতির এই ভালবাসায় আমিও সায় দিয়ে গেলাম।

শ্রীমতিকে তার হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আমার হোস্টেলে ফিরে এলাম আমি। এরপর কেটে গেল তিন চার দিন। প্রথম দিন দুয়েক শ্রীমতির ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও এর পরে সে ঘোর কেটে যেতে লাগলো। পড়াশোনায় মন দিয়ে ফের আমি পূর্বাবস্থায় ফিরে এলাম। কিন্তু ছোট

বইঘর.কম ও রোকন

গল্পের মতো শেষ হয়েও হলো না শেষ। শ্রীমতির প্রসঙ্গ শেষ না হয়ে সেটা আবার শুরু হলো দুর্বার বেগে।

আমার রুমে আমি পড়াশোনায় মন দেয়ার চেষ্টা করছি, এই সময় আমার রুমের ঠিক নীচের রুমে অবস্থানকারী আর আমার সাথে এক ক্লাসে পড়া ছাত্র শাহাদত হোসেন শিবু এসে আমাকে অভিযোগের সুরে বললো, আরে, নীচের তলায় সিঁড়ির কাছে এসে তোর বোন তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে আর তুই দিব্যি বই খুলে বসে আছিস, যা যা, জলদি নীচে নেমে যা।

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, আমার বোন!

শিবু মিয়া সশব্দে বললো, আরে হ্যাঁ, শ্রীমতি শ্রীমতি। এই পাশের গার্লস্ স্কুলে পড়ে না তোর বোন শ্রীমতি?

খেয়াল হতেই আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। শ্রীমতি আমার খোঁজে ছেলেদের এই হোস্টেল পর্যন্ত এসেছে শুনে আমার যেমন রাগ হলো কিছুটা, তেমনি আমার বোন বলে পরিচয় দেয়ায় মনে মনে তার বুদ্ধিমত্তার তারিফ না করেও পারলাম না। আমার সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, এমন একটা তরুণী ছেলেদের হোস্টেলে এসে আমাকে খুঁজছে, এমনটি রটে গেলে একটা কেলেংকারী হয়ে যেতো। অত:পর আমার হোস্টেল মেট্‌দের টিকা-টিপ্‌পনীতে জানটা আমার ঝালাপালা হয়ে যেতো। শ্রীমতির এই বুদ্ধিমত্তা তার বয়সেরই ফসল। উল্লেখ্য সে ক্লাস টেনের ছাত্রী হলেও বয়সে আর গায়ে পায়ে আমার সাথে পড়ুয়া আই.এ.পরীক্ষার্থী অনেক মেয়ের চেয়েও শ্রীমতি অনেকটাই বড়। স্কুলের ছাত্রী, পয়লা একথা শুনেই আমি বুঝেছিলাম, বেশি বয়সে পড়াশোনা শুরু করেছে সে, নইলে কোন স্কুলের ছাত্রী এতটা বাড়ন্ত হয় না।

আমাকে নীরব দেখে শিবু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার, গার্লস্ স্কুলে পড়ে না তোর কোন্ বোন?"

আমি শশব্যস্তে বললাম, হ্যাঁ, পড়ে, পড়ে! এই তো কয়েক দিন আগেই আমি বাড়ি থেকে এনে ওকে হোস্টেলে তুলে দিয়ে এলাম।

শিবু বললো, তবে? যা যা, নীচে যা।

আমি দ্রুত পদে রওনা হলেম। শিবু মিয়া পেছন থেকে মন্তব্য করলো, শালা, তোর এমন একটা বোন আছে, মানে তোর বোনটা এত সুন্দরী, একথা তো এতদিন বলিস্‌নি?

বইঘর.কম ও রোকন

নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগলো শিবু। গা আমার জ্বলে গেল শিবুর এই কথায়। কিন্তু শ্রীমতি নীচে আমাকে খুঁজছে বলে সংগে সংগে শিবুর কথার কোন জবাব দিতে না গিয়ে আমি তড়িঘড়ি নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। নেমে এসে দেখি, সিঁড়ির নীচেই দাঁড়িয়ে শ্রীমতি তখনও একে ওকে জিজ্ঞেস করছে আমার কথা। আমি নীচে নেমে এলে আমাকে দেখেই শ্রীমতি ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, আরে এই যে দাদা, এই যে, তা কত নং রুমে থাকেন আপনি সেটা আমাকে জানাননি কেন? আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে কী হয়রানই না হচ্ছি!

ঘটনাটা অধিক গড়াতে না দিয়ে আমিও ব্যস্ত কণ্ঠে বললাম, ওপরে, আমি দোতলায় থাকি। এসো...।

সিঁড়ির পাশেই দোতলায় ডাব্‌ল্ সীটের রুমে আমি থাকি। আমার রুমমেট্ বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে বেশ কিছু দিনের জন্যে বাড়িতে চলে গেছে গত পরশু। ফলে আমার রুমে এখন একাই আছি আমি। শ্রীমতিকে সংগে নিয়ে আমি আমার রুমে চলে এলে শ্রীমতি প্রশ্ন করলো, সেকি দাদা, এ রুমে একাই থাকো তুমি?

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, 'তুমি, তুমি' করবে আমাকে। 'আপনি আপনি' করবে না। আর সেই সাথে আমাকে দাদা বলবে না। বলবে, ভাইজান।

ভাইজান বলবো?

হ্যাঁ, ভাইজান বলবে। আমার বোন সেজেছো তুমি যখন, আমার নিজের বোনের পরিচয়ই সবার কাছে দিতে হবে তোমাকে। এদিকে সবাই আমাকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান বলে জানে। কাজেই আমার বোন আমাকে ভাইজান বলবে, এইটেই স্বাভাবিক। আর কখনো দাদা বলবে না আমাকে। এছাড়া তোমার নাম চেমন আরা। শ্রীমতি বলবে না কাউকে।

আচ্ছা, আচ্ছা, আর কখনো বলবো না।

ঐ যে আমার রুমমেটের ঐ চেয়ারটা টেনে এনে বসো। মুছেই রেখেছে সুইপার।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে চেমন আরা শ্রীমতি প্রশ্ন করলো, ও, তা তোমার রুমমেট কোথায়? এ রুমে একাই থাকো তুমি?

আপাতত একাই। পরীক্ষা দিয়ে আমার রুমমেট বেশ কিছু দিনের জন্যে বাড়িতে চলে গেছে। তার ফিরে আসতে দেরী হবে।

বইঘর.কম ও রোকন

উল্লসিত হয়ে উঠলো শ্রীমতি। বললো, ও মাই গড! ঘরে তুমি একা এখন? কী আনন্দ! তোমার ঘরে আসতে আমার তাহলে আর মোটেই কোন বাধা-বিপত্তি নেই। ঘন ঘনই আসার সুযোগ আছে তাহলে। থ্যাংস্ টু গড।

ঐ 'ওমাই গড', 'থ্যাংস্ টু গড' এসব ছাড়তে হবে তাহলে!

ছাড়তে হবে? তাহলে কি বলবো?

বলবে, 'সোবহান আল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' এই সব।

তাই সই! তাই সই। তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে আমি সব কিছুতেই রাজী।

রাজী? এত সহজেই রাজী হয়ে গেলে?

হবো না? মনটা আমার কেড়ে নিয়ে এসে পালিয়ে থাকবে তুমি, সেটি কখনো হবে না। তোমাকে সব সময় আমি আমার চোখের সামনে রাখতে চাই।

চেমন আরা!

চেমন আরা কেন? আমার ডাক নাম তো শ্রীমতি?

ওটাও বাদ দিতে হবে।

বাদ দিতে হবে! ও হ্যাঁ, তুমি তো আবার শ্রীমতি নাম পছন্দ করো না। ঠিক হ্যায়! তোমার পছন্দই আমার পছন্দ। তুমি ছাড়া আর তো আমার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকছে না।

থাকছে না?

না থাকছে না। মনটা আমার পুরোপুরি কেড়ে নেয়ার পর এখন পৃথক হতে চাইলেই কি পৃথক হতে দেবো আমি?

বলো কি?

কি বলবো? সেই যে সেদিন আমার হোস্টেলে আমাকে ভুষির বস্তার মতো ফেলে দিয়ে চলে এলে, আর সেখানে গেলে না। বুঝি আমার দুঃখ হয় না এতে?

চেমন আরা!

সেই যে তুমি চলে এলে, এরপরে আর কোন কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না। শয়নে স্বপনে কেবল তোমার মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো আমার। নাওয়া-খাওয়া চুলোয় গেল বিলকুল। এভাবে আর কয়দিন চলে?

সেকি! সামনে তোমার হাফ্ইয়ারলী পরীক্ষা!

চুলোয় যাক পরীক্ষা! আগে তোমাকে কাছে পাওয়া চাই—তারপর পরীক্ষা।

আমাকে কাছে পাওয়া মানে?

কাছে পাওয়া মানে, বিয়ে-থা যখন হয় হবে। এখন তোমাকে হামেশাই দেখতে না পেলে আমার সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। তোমাকে দেখার জন্যে প্রাণ আমার সব সময় আকুলি-বিকুলি করে। কাজেই তুমি যদি ঘন ঘন আমার ওখানে না যাও, আমাকেই ঘন ঘন আসতে হবে এখানে।

ঘন ঘন আসবে?

আসবো তো!

আমার বাপকে তো কথা দিয়েছো আমার পড়াশোনাটা দেখিয়ে দেয়ার আর কঠিন জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেয়ার। ঘন ঘন না এলে তুমি আমাকে দেখিয়ে দেবে কী আর বুঝিয়ে দেবে কী? ঘন ঘন এলে আমার রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে, বুঝলে সাহেব? চেমন আরা হাসতে লাগলো।

আমি বললাম, কিন্তু ঘন ঘন আসবে তুমি কি করে? তোমার হোস্টেলের সুপার...!

সুপারকে জানতে দেবো কি? দারোয়ানকে ম্যানেজ করে আসবো। মোটা বকশিশ্ দিলে ঐ দারোয়ানই আমাকে পথ করে দেবে সব সময়।

আচ্ছা!

যতদিন তোমাকে আমার লোকাল গার্জেন বানাতে না পারছি, ততদিন এই পথেই চলতে হবে।

এই পথেই চলতে লাগলো চেমন আরা শ্রীমতি। দারোয়ানকে ম্যানেজ করে সে ঘন ঘনই আসতে লাগলো আমার হোস্টেলে। বইখাতা সাথে করে আনলেও যতটা না পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত রইলো সে আমার এখানে এসে, তার চেয়ে অধিক ব্যস্ত রইলো আমাকে নিয়ে। আমার প্রতি তার ভালোবাসার আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা নিয়ে। প্রেমের বাজারে আমি একেবারেই নয়া এক খরিদদার। আমিও বর্তে গেলাম চেমন আরার মুহব্বতের পরশে।

অত:পর তার প্রতি আমার করণীয় অনেক বেড়ে গেল। অচিরেই সে হোস্টেলে ডেকে আনলো তার বাপকে আর বাপকে দিয়ে বাপের জায়গায় তার লোকাল গার্জেন বানিয়ে নিলো আমাকে। ব্যস্! এরপর আর

বইঘর.কম ও রোকন

শ্রীমতিকে পায় কে? এরপর থেকে আর তার দারোয়ানকে ম্যানেজ করার কোন ঝুট ঝামেলা রইলো না। লোকাল গার্জেনের কাছে যাবে বলে সে যখন তখন আসতে লাগলো আমার কাছে। তার লোকাল গার্জেন হিসাবে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আমাকেও কয়েকবার যেতে হলো তার স্কুলে এবং হোস্টেল সুপারসহ হেড মিস্ট্রেসের সাথে পর্যন্ত সে পরিচয় করে দিলো আমার। এই পরিচয় করে দেয়ার মধ্যে আমাদের উভয়ের সাথে উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধেও একটা ভাসা ভাসা ধারণা সে দিয়ে গেল সবাইকে।

কিছু দিনের জন্যে লাটে উঠলো পড়াশোনা আমার। অল্প দিন পরে পরেই সে বাড়িতে গেল কয়েকবার আর প্রতিবারেই তার সঙ্গে যেতে হলো আমার আর ফিরে আসার সময়ও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হলো আমাকে। এতে করে তার বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজন বেজায় খুশি হলেন আর আমাকে তাঁদের হবু জামাই হিসাবেও ধরে নিলেন তাঁরা।

এরপরেই পাল্টে গেল দৃশ্যপট। জরুরী প্রয়োজনে আমাকে বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুদিন সেখানেই থাকতে হলো। এর পর হোস্টেলে ফিরে এসে আমি শ্রীমতির পথ চেয়ে রইলাম। কিন্তু শ্রীমতি আর এলো না। ঘটনা কি জানার জন্যে তার স্কুলে গিয়ে খোঁজ করলাম তার। খোঁজ নিতে গিয়ে যা শুনলাম তাতে আমি রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেলাম। গেটেই দারোয়ান আমাকে জানালো, শ্রীমতি স্কুলে নেই। তার লোকাল গার্জেনের সাথে সে তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে গেছে।

এই দারোয়ানটি নতুন। আমি যে শ্রীমতির লোকাল গার্জেন, এই দারোয়ান তা জানে না। শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলেম। আবার কে লোকাল গার্জেন হলো তার? নতুন দারোয়ানটি আরো জানালো, বাড়িতে যাওয়ার আগেও শ্রীমতি ঘন ঘন তার ঐ লোকাল গার্জেনের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছে। গার্জেনটা গেটে এসে ডাক দেয় আর শ্রীমতি রুম থেকে বেরিয়ে এসে তার সাথে যেন কোথায় চলে যায়!

দারোয়ানকে প্রশ্ন করলাম, তার ঐ লোকাল গার্জেনকে তুমি দেখেছো?

দারোয়ান বললো, জি, দেখেছি। আপনার বয়সেরই এক ছেলে। কলেজে পড়ে।

কলেজে পড়ে? কোন্ কলেজে।

সে সব কিছু বলতে পারবো না আমি।

পারবে না?

জি না। শ্রীমতি তার ঐ লোকাল গার্জেনটাকে একদিন দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, এই ইনিই আমার লোকাল গার্জেন। ইনি এই গেটে এলেই আমাকে ডেকে দেবে। তাই আমি ডেকে দিই সব সময়।

দারোয়ানটির কাছে আর কোন তথ্য পেলাম না। হোস্টেলে ফিরে এসেও একে ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, শ্রীমতি এদিকে আর অনেক দিন আসেনি। কেউ তাকে অনেক দিন আর দেখেনি। www.boighar.com

এসব শুনে বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। শ্রীমতি যখন নিজেই ভিন্ন পথ ধরেছে তখন আর তাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে যাই কেন? এর মধ্যে পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষা শেষ করে কয়েকদিন রেস্ট নিলাম। এরপর বেডিংপত্র বেঁধে নিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম। আই.এ.পরীক্ষার ফল বেরুনোর আগে কলেজে আর কোন কাজ নেই আমার। হোস্টেল ত্যাগ করার আগে শ্রীমতির খবরটা নেয়ার বড় ইচ্ছে হলো। তাই বেডিংপত্র বেঁধে রেখে গেলাম একবার শ্রীমতির স্কুলে। গেটেই সেই দারোয়ানের সাথে দেখা। শ্রমিতির কথা জিজ্ঞেস করতেই দারোয়ানটি বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সেকি! কিছুই জানেন না স্যার? আজ শ্রীমতির বিয়ে।

চমকে উঠে বললাম, বিয়ে! কার সাথে?

দারোয়ান বললো, তার ঐ লোকাল গার্জেনের সাথে।

লোকাল গার্জেনের সাথে? কোথায় হচ্ছে সে বিয়ে?

শ্রীমতির গাঁয়ের বাড়িতে। তার ঐ লোকাল গার্জেনকে সাথে নিয়ে গত পরশু শ্রীমতি তার গাঁয়ের বাড়িতে গেছে।

বলো কি! তুমি এসব জানলে কি করে?

বাহ্! জানবো না? শ্রীমতি স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে সবাইকে একথা জানিয়ে গেছে যে!

তাজ্জব!

তাজ্জব হয়েই ফিরে এলাম হোস্টেলে। বেডিংপত্র গোছানোই ছিল। সেগুলো নিয়ে আমিও রওনা হলেম গাঁয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ট্রেন থেকে নেমে বাড়িতে যাওয়ার সেই নদীপথ আর তা শ্রীমতিদের ঘাটের পাশ দিয়েই। নৌকাটা আমার শ্রীমতিদের ঘাটের কাছে আসতেই দেখি, সেদিনের সেই জনশূন্য ঘাটটা আজ জনাকীর্ণ হয়ে গেছে। সবাই

বইঘর.কম ও রোকন

উৎফুল্লভাবে ঘাটের দিকে আসছে আর ঘাট থেকে উঠে যাচ্ছে। কতকটা বুঝতে পারলাম নিজেই। তবু ঘাটের একজনকে এই জনসমাগমের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, গতকাল শাদি হয়েছে ঐ যে ঐ বড় বাড়ির মালিক নজিবর রহমান তালুকদারের মেয়ের। আজ সেই শাদি উপলক্ষে খানাপিনার মজলিস্ দেয়া হয়েছে তো? তাই এই লোক সমাগম হয়েছে।

লোকটি অংগুলি নির্দেশ করে লোকালয়ের একটা বাড়ি দেখিয়ে দিলো।

আমি ফের প্রশ্ন করলাম, যার শাদি হলো তার নাম কি শ্রীমতি?

জবাবে লোকটি বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রীমতি।

কোথায় হলো তার শাদি? মানে বরটি কে?

তা তো ঠিক বলতে পারবো না, তবে শ্রীমতি যে শহরে পড়ে, বরটা সেখানেরই এক কলেজের ছাত্র।

বরটার নাম জানো কি?

জি না, সেটা ঠিক জানিনে। কিন্তু কেন বলুন তো?

এটা জানা আমার খুবই দরকার।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে আমি নেমে এলাম নৌকা থেকে আর সরাসরি গিয়ে হাজির হলেম শ্রীমতিদের দহলীজের (বৈঠকখানার) সামনে। সেখানে তখন অনেক লোক। তাঁদের একজন এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝি আমন্ত্রিত মেহমান? আসুন আসুন, বসুন ঐ বৈঠকখানায় গিয়ে।

বললাম, জি না, বসবো না! আমি একটু কথা বলবো শ্রীমতির সাথে।

কপালে ভাঁজ পড়লো ভদ্রলোকের। প্রশ্ন করলেন, শ্রীমতি মানে? গতকাল যার শাদি হলো, তার সাথে?

জি, জি।

আপনি তার কে হন?

আমি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অতি পরিচিত জন। আমার নামটা তাকে বললেই সে ছুটে আসবে আমার সাথে দেখা করতে।

কি নাম আপনার?

আমার নাম সালাউদ্দীন আহমদ। শ্রীমতির স্কুলের পাশে হোস্টেল থাকি।

তাই? আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি শ্রীমতির মামা। এক্ষুণি গিয়ে আমি শ্রীমতিকে আপনার কথা বলছি!

বইঘর.কম ও রোকন

ভদ্রলোক হৃষ্টচিত্তে অন্দর মহলে গেলেন এবং খানিক পরেই রুষ্টভাবে ফিরে এসে আমাকে সরোষে বললেন, আপনি যে পথে এসেছেন এখনই সেই পথে ফিরে যান। শ্রীমতি আপনাকে চেনে না।

চেনে না?

না। শ্রীমতি বললো, এ নামের কাউকে আমি চিনিনে। নিশ্চয়ই কোন মতলববাজ আমাদের বিবাহিত জীবনটা নষ্ট করার মতলব নিয়ে এখানে এসেছে। ওকে এখনই তাড়িয়ে দিন।

এই কথাই বললো সে?

হ্যাঁ, এই কথাই বললো।

আপনি, আমার কথা শ্রীমতিকে ঠিক ঠিক বলেছিলেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিকই বলেছি। আমি তার নিজের মামা। আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি? আপনি বিদায় হোন। স্বেচ্ছায় না গেলে শ্রীমতি আপনাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিতে বলেছে। যান যান, মান থাকতে ভালোই ভালোই বিদায় হন এখান থেকে।

ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমি কি করবো ভাবার আগেই যা দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময়ের অবধি রইলো না! হোস্টেলে আমার রুমের নীচের রুমটিও সিঁড়ির পাশে হওয়ায় ওটাও ছিল ডারল সীটের রুম। দেখি, আমার ক্লাস ফ্রেন্ড আর আমার রুমের সেই নীচের রুমে অবস্থানকারী শাহাদত হোসেন শিবু তার রুমমেট রওশন আলীসহ হাসতে হাসতে অন্দর মহল থেকে বাহির বাড়িতে আসছে। শিবুর সাথে রওশন আলীকে এখানে দেখে আমি বিস্মিত হলেম। রওশন আলী একজন সমঝদার ও বিবেকবান ছেলে। জ্ঞানী ও ধীর স্থির। সে এই উচ্ছৃঙ্খল শিবুর সাথে ও এত দূর এসেছে, ঘটনা কি? পরক্ষণেই খেয়াল হলো, হয়তো রওশন আলী তার রুমমেট শিবুর হাত এড়াতে না পেরেই শিবুর সাথে এত দূর এসেছে। কিন্তু এ বিয়েতে এরা কেন?

কিন্তু চিন্তা করার অধিক অবকাশ পেলাম না। আমার ওপর নজর পড়তেই শাহাদত হোসেন শিবু বিপুল হাসির সাথে রওশন আলীকে বললো, ঐ যে, ঐ দ্যাখ দ্যাখ্ হতাশ প্রেমিক! হতাশ প্রেমিক লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে!

আমার দিকে চেয়েই রওশন আলী মন্তব্য করলো, তাই তো! আহারে বেচারা!

বইঘর.কম ও রোকন

শিবু ফের রওশন আলীকে বললো, হাজার হোক, ও আমাদের ক্লাস ফ্রেন্ড! অপমানিত হওয়ার আগে ওকে ডেকে নিয়ে বাইরে যা আর বাইরে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে বিদায় করে দে। শ্রীমতি ক্ষেপে গেলে বাতাস পাবে না হাড়ে ওর।

লোকজনের হৈ হুল্লোরের মধ্যেও ওদের সব কথাই শুনতে পেলাম। তাই রওশন আলী এসে ইংগিত দিতেই আমি এ বাড়ির বাইরে এলাম তার সাথে। আমার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছিল। ঘটনাটা জানার জন্যে তর সইছিল না আমার। বাইরে এসেই রওশন আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, কার সাথে শ্রীমতির শাদি হলো রওশন?

রওশন আলী ভারি কণ্ঠে বললো, কার সাথে আবার! আমাদের ঐ শাহাদত হোসেন শিবুর সাথে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো আমার!

বললাম, সেকি! এটা সম্ভব হলো কি করে?

রওশন আলী বললো, কেন, অসম্ভব কিসে?

বললাম, কিসে মানে? শ্রীমতি তো আমাকে শাদি করার জন্যে পাগল হয়ে ছিল।

হ্যাঁ ছিল, ভুল করেছিল।

ভুল করেছিল!

নিছক ভুল করেছিল। ভুল করে তোকেই সে তার মনের মানুষ ভেবেছিল। কিন্তু তার সত্যিকারের মনের মানুষের সন্ধান পাওয়ামাত্র তার সে ভুলটা ভেঙে গেছে ষোল আনাই। তোকে তার বেজায় না-পছন্দ এখন।

না-পছন্দ? কেন?

স্বাভাবিক কারণেই, শ্রীমতি স্বভাবগতভাবেই একটা পুরোপুরি অতি আধুনিকা মেয়ে। তার পাশে তুই একটা তথাকথিত সেকেলে ছেলে। মেয়েদের মন পাগল করা তোর এই চেহারা দেখেই ভুল করে সে তোর প্রেমে পড়ে যায় আর ভুল করেই তোকে তার মনের মতো মানুষ ভাবে। কিন্তু তেলে জলে কি আর মিল খায় শেষ পর্যন্ত?

অর্থাৎ?

গরমিলটা ধরা পড়ে গেছে। বললামই তো মনমানসিকতায় শ্রীমতি আসলেই আধুনিকা। গ্রাম থেকে শহরে এসে সেই আধুনিক মেয়েটা

অতিআধুনিকতার জোয়ারে এখন টালমাটাল। সেই মেয়েকে তুই কোন নাচ-গানে, সিনেমা-বায়োস্কোপে, ক্লাবে-পার্টিতে, মেলায়-খেলায়, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, বারে-রেস্তোঁরায়, আউটিং-পিকনিকে কোথাও নিয়ে যাসনি। এগুলো সবই তোর না-পছন্দ হেতু এসবে যেতে তাকে কোন উৎসাহও দিস্‌নি, অথচ এসবই শিবুর জীবন। আর সে আকণ্ঠ ডুবে আছে এসবের মধ্যে। শ্রীমতিকে এসবে দিতে সে একপায়ে খাড়া।

রওশন আলী!

ওদিকে তুই আবার শ্রীমতির নাম, ভাষা, চলন-বলন সব কিছুর সংস্কার করতে চেয়েছিলি। চেয়েছিলি শ্রীমতিকে পর্দা-আব্রুর মধ্যে রাখতে আর সংযম শিক্ষা দিতে।

কেন, সেটা কি খুবই অন্যায় হয়েছে আমার? মেয়েরা অধিক মাতামাতি না করুক, অধিক উচ্ছৃঙ্খল না হোক, এটাই তো বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সবার তা পছন্দনীয় নাও হতে পারে।

www.boighar.com

নাও হতে পারে?

অফকোর্স! শ্রীমতিকে তুই একটা আদর্শ মেয়ে বানাতে চেয়েছিলি। আর তাতে করে কেবলই ভস্মে ঘি ঢেলেছিস তুই। যে, যে জাতের নয়, তুই তাকে সেই জাতে তুলে নিতে চেয়েছিলি।

রওশন!

ভুলে যাচ্ছিস কেন, এটা একটা অতিআধুনিক যুগ। অগ্রসর মানুষের দোহাই দিয়ে মানুষ এখন অধিকাংশই বন্য জীবন যাপনে তথা স্বেচ্ছাচারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। নিকট অতীতের সেই সভ্য-ভব্য যুগটা ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেছে রাতারাতি। এ যুগের নব্বই পারসেন্ট মেয়েরা মিডিয়ার বদৌলতে পাল্টে গেছে সেই সাথে। এই পঁচানব্বই পারসেন্ট মেয়েরা আকাশ কুসুমের স্বপ্নে বিভোর। তারা চায় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, সমাজ, ধর্ম, রুচি, নিষ্ঠা— সব কিছু দুই পায়ে মাড়িয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা মেলে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াতে। এ যুগে শতকরা পাঁচটা আদর্শ মেয়ে পাওয়াও দুষ্কর।

বটে!

শ্রীমতি ঐ শতকরা পঁচানব্বইজনের দলে। তুই গিয়েছিল সেই উড়ংকি পক্ষীর পায়ে সভ্যতা আর আদর্শের শেকল পরাতে। সাময়িক একটা ঘোরের মধ্যে কিছু দিন সে ঐ শেকলটা মেনে নিলেও সেটা চিরস্থায়ী

বইঘর.কম ও রোকন

হয়নি। তার সেই শেকল কেটে দিয়েছে আমাদের শাহাদত হোসেন শিবু মিয়া।

শিবু মিয়া?

জি, তোর কাছে শ্রীমতি যা পায়নি শিবুর কাছে সে তা পেয়েছে অবারিতভাবে।

বলিস্ কি! শিবুর সংস্পর্শে সে কিভাবে গেল?

অবলীলাক্রমে! সেই যে তুই বাড়িতে গিয়ে অনেক দিন থাকলি, সেই ফাঁকে। তোর খোঁজে শ্রীমতি পরপর কয়েক দিন আমাদের হোস্টেলে এলো। তোকে না পেয়ে সে যখন হতাশ, তখন সেই সুযোগ নিলো শিবু। ওপর তলা থেকে নেমে এসে শ্রীমতি যখন সিঁড়ির কাছে খেদ প্রকাশ করতে লাগলো তখন শিবু তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের রুমে বসালো। শুরু হলো গল্প-আলাপ আর অল্পতেই শ্রীমতি শিবুর মধ্যে দেখতে পেলো তার মনের আসল মানুষ। শ্রীমতি বুঝতে পারলো, তার মন যা চায়, শিবুই তা কানায় কানায় ভরে দেয়ার মানুষ! তুই নোস্। ব্যস্, একে একে দুই। তুই এখন বিলকুল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার।

রওশন!

কেটে পড়ু। মরীচিকার পেছনে আর ছুটিসনে।

ওখান থেকে কেটে পড়লাম। টলতে টলতে এসে ফের নৌকায় উঠে বসলাম। নৌকা আমার গ্রামের পথ ধরলো।

একটা স্কুলের ছাত্রীর কাছে এমন একটা দাগা খেয়ে প্রেম করার শখ আমার কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল মন থেকে। আর কয়েক বছর ভুলেও পা বাড়াইনি ও পথে। আই.এ. পাস করলাম, অনার্স পাস করলাম, রাজধানীতে চলে এলাম এম.এ. পড়ার জন্যে। রাজধানীর বাইরেও আরো ভার্সিটি আছে। তবু রাজধানীতে এলাম আধুনিক জ্ঞান ও বহির্বিশ্বের হাল হাকিকত বেশি বেশি জানার জন্য। এই লম্বা সময়ের মধ্যে আর প্রেম-পিরীতের কথা ভুলেও ভাবিনি। ইশ্কের আধিক্যে কত কপোত-কপোতী চোখের সামনে জড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউনিভার্সিটি নামক এই বৃন্দাবনে! আমি চোখ তুলে সেদিকে তাকাইনি।

পাশাপাশি আমার চেহারা দেখে আর গাঁয়ে আমার অনেক জোত-সম্পত্তি আছে জেনে গ্রামের আর শহরের অনেক মেয়েই পেরেশান হয়েছে আমার সাথে পাত্তা লাগনোর জন্যে। আমি পাত্তা দিইনি তাদের কাউকেই।

বইঘর.কম ও রোকন

এখন এই যে রাজধানীতে এসেছি, এখানেও চোখ আমার প্রায় বন্ধই রেখেছি। রাজধানীতে নতুন আমি, লোকজনকে তেমন একটা চিনিনে। তবু ভার্সিটির প্রাঙ্গণে তথা এই কেষ্টধামে, চেনা-অচেনা যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে ফ্রি-স্টাইল মুহব্বত আর বেহায়া চাল-চলন চোখে এসে গুতো মারছে চলতে ফিরতেই, তাতে আরো সজাগ হয়ে চোখ দুটোকে শক্ত শাসনে রাখতে হচ্ছে আমাকে। পেটে 'গাবের বিচি আটকে যাওয়া বাদুড়ের মতো, 'আর গাব্বু খাবু না, গাব্বু তলা যাবু না' এমনই জপমালা জপে যাচ্ছি সমানে।

কিন্তু সকলই গরল ভেল। কোন্ ফাঁকে যে এই জপ-তপ আমার ছুটে গেল আপসে আপ্, তা ভালো করে বুঝতেই পারলাম না। এর মধ্যেই ঐ পেট খালি হওয়া বাদুড়ের মতোই 'আর গাব্বু খাবু না, গাব্বু তলা যাবু না' বলে মনটা আমার নাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। ফস্‌কে গেল পা আবার। বয়সেরই দোষ আর কি?

আই.এ.-তে স্ট্যান্ড করেছি, অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি, এম.এ.-তেও ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রশস্ত দেখে বিলকিস আরা বিউটি নামের অনার্স ফাইন্যাল ক্লাসের এক ছাত্রী আমার পিছু নিলো তোড়ে-জোরে। মাথার ওপর একটা হাফ বোরকা দিয়ে আব্রু করা এই মেয়েটি বেশ কিছু দিন ধরেই আমার চারপাশে অবিরাম পাক খেয়ে ফিরছিল। কি যেন সে বলার চেষ্টা করেও বলার সুযোগ পাচ্ছে না বলে মনে হলো। ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে এসে আমি রাস্তার এক নিরিবিলি স্থানে দাঁড়াতেই ঐ মেয়েটা রাস্তা থেকে এগিয়ে এলো সামনে। খানিকটা দূরে থেকেই আমার দিকে হাত তুলে তাজিমের সাথে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম!

সালামের জবাব দিতেই হলো। ওয়ালাইকুমুস্ সালাম! বলে আমি চারদিকে তাকালাম। দেখলাম, আমি ছাড়া আর কাছে-ধারে কেউ নেই। তাই বাধ্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, আমাকে কিছু বলতে চান?

আর একটু এগিয়ে এসে মেয়েটি সলজ্জ কণ্ঠে বললো, জি, জি, অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করছি, কিন্তু বলার সুযোগ পাইনি।

মুখের ঢাকনাটা তুলে ঘাম মুছলো মেয়েটি দেখলাম, মেয়েটি বেশ সুন্দরী। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই সুন্দরী। বললাম, বলুন, কি বলতে চান?

মুখের ঢাকনাটা দিয়ে ফের মুখ ঢেকে মেয়েটি। বললো; যা বলতে চাই সেটা বলার আগে একটা অনুরোধ করতে চাই আপনাকে। বয়সে আমি আপনার ছোটই হবো। তাই দয়া করে আপনি আমাকে তুমি বলবেন।

আমি ঝটপট বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমিই বলবো। কিন্তু তুমি কে আর কী বলতে চাও আমাকে, সেটা বলো তো দেখি?

আমার নাম বিল্‌কিস্‌ আরা বিউটি। আমি অনার্স ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ি। আপনার সাব্‌জেকটেই অনার্স পড়ি আমি।

ও আচ্ছা! তারপর?

তারপর, কথা হলো, আপনার চরিত্র আর চালচলন মুগ্ধ করেছে আমাকে। ভার্সিটির গাদা গাদা উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের চেয়ে আপনি আলাদা। একেবারেই পৃথক এক মানুষ। একজন আদর্শ মানুষ। তাই...!

তাই মানে?

আপনাকে এজন্যে অভিনন্দন জানানোর একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে অনেক দিন থেকে। অন্তত একটা সালাম জানানোর দুর্বার তাকিদ ছিল মনে আমার। আজকে সেই সালাম জানানোর সুযোগটা পেলাম। এদেশের যুবক সম্প্রদায়ের আপনি এক মুকুটমণি। আল্লাহ তায়ালা কল্যাণ করুন আপনার, এই কামনাই করি।

ধন্যবাদ! আর কিছু বলবে?

জি, আরো কিছু বলতে চাই বটে। কিন্তু সেটা আজ নয়। সুযোগ দিলে অন্য দিন বলবো।

আজ বলতে কি কোন অসুবিধা আছে?

তা মানে, আপনি আবার কি মনে করেন, পড়াশোনার ব্যাপারে আপনার কিছু সাহায্য আমার দরকার। আপনার সাব্‌জেকটেই অনার্স পড়ি তো। তাই বিরক্ত বোধ না করলে আপনার কাছে একটু আধটু সাজেশান নিতে আসতাম। তা ছাড়া আপনার মতো মহৎ আর ঈমানদার ব্যক্তির আদেশ, উপদেশ পেতেও জিয়াদা ইচ্ছা করে বৈ কি! তাতে হয়তো অনেক সোয়াব কামাবার সুযোগ পেতাম আমি।

চেহারাটা তার ভালো লাগলো। কথা-বার্তার ধরনটাও প্রশংসনীয়। তাই ফস্‌ করে বলে ফেললাম, বেশ এসো। ক্লাস শেষে প্রায়ই আমি একাই বসে থাকি ক্লাস রুমে। নিরিবিলিতে একটু বই-পুস্তক নাড়াচাড়া করি। তখন এসো। যতটুকু পারি সাহায্য করবো তোমাকে।

ব্যস্! এর পর থেকেই শুরু হলো বিলকিস্ আরা বিউটির সাথে আমার মেলামেশা। বিউটি তার সুন্দর আচরণে আর বিনম্র স্বভাবে আমাকে ক্রমেই আকৃষ্ট করতে লাগলো। অবশেষ আমাদের মধ্যে জন্ম নিলো ভালোবাসা। পর্দা আব্রু করা এই মেয়েটির ভালোবাসার কাছে আমি সহজেই আত্মসমর্পণ করলাম। ভেবে দেখলাম, শ্রীমতির মতো কষ্ট করে একে আদর্শ মেয়ে বানাতে হবে না। বিলকিস আরা বিউটি স্বভাবগতভাবেই একজন আদর্শ মেয়ে। এটা দেখে আমি আরো পরিতৃপ্ত হলাম। মনে হলো, এত দিনে আমি যেমনটি চাই, ঠিক তেমন একটা মেয়ে পেয়েছি।

তুলনা করলে বলতে হয় আমার পাওয়াটা অনেকটা ঐ কবিতার মতো। কবিতাটি মোটামুটি এই রকম—

কাঁকুড় ক্ষেতে মাচা বেঁধে তিন কড়ি রায়
চোর শেয়াল তাড়াতে এসে আরামে ঘুমায়।
এই সুযোগে ডজন কয়েক শেয়াল ঢুকে ভূঁইয়ে
সব কাঁকুড়ের শ্রাদ্ধ করে তিন কড়ি রয় শুয়ে।
তিনুর ছিল নেড়ে মাথা, টিকি ছিল মোটা,
শেয়াল ভাবে এই পেয়েছি তরমুজ এক গোটা।

তরমুজ আর তিনুর মাথা এক জিনিস নয়। আমার পাওয়াটাও এই রকমই। সে কথা পরে।

উভয়ের প্রেমে শক্তভাবে বাঁধা পড়লাম আমরা উভয়েই। ফলে মন-প্রাণ উজাড় করে বিউটির পড়াশোনায় সাহায্য করতে লাগলাম আমি। আমার হবু স্ত্রী আমার মতোই অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাক, এই বিবেচনায় অনার্সের আমার যত নোট ছিল সেগুলো সবই তাকে দিয়ে দিলাম সেই সাথে নিজের পড়াশোনা বন্ধ করে এবার পরীক্ষায় আসতে পারে এমন অনেক প্রশ্নের নতুন নোট তৈরি করে দিলাম তাকে। এর সাথে জরুরী ও জটিল প্রশ্নোত্তরগুলো পাখিপড়ানো পড়িয়ে গেলাম তাকে লাগাতার কয়েক সপ্তাহ ধরে। অন্য কথায় পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল করার মতো সর্বঅস্ত্রে সাজিয়ে দিলাম তাকে।

এরপর হঠাৎ দেখি কিছুটা ঢিলা হলো বিলকিস্ আরার আমার কাছে আসা-যাওয়া। সাক্ষাতে প্রশ্ন করলে সে আমাকে বললো, যে নোটগুলো

বইঘর.কম ও রোকন

দিলেন আপনি আমাকে সেগুলো মুখস্থ করতে হবে না? আপনার কাছে ঘন ঘন আসতে গেলে নোটগুলো মুখস্থ করবো কখন?

কথায় তার যুক্তি আছে। সেটা বুঝেই বিউটির সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে অধিক উদ্‌গ্রীব হলাম না। তার পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই শাদি হবে আমাদের এটা আগে থেকে স্থির ছিল। তাই শাদির পরে চিরকাল তাকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার আশায় তার না আসার এই বর্তমান বিরহটা নীরবে মেনে নিলাম।

আমার এই একা থাকার সময়ই সামনে এলো ভ্যালেন্টাইন ডে অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। এই ভ্যালেনটাইন দিবস সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। বাঁধনের বাঁধনহারা ভ্যালেন্টাইন ডে উদ্‌যাপনের কাহিনী কাগজে পড়েছি। কিন্তু বস্তুটি কি তা কখনো দেখিনি। এবার তা দেখার বড়ই শখ হলো। নির্দিষ্ট দিনের মাঝরাতে আমি তাই একপা দুই পা করে নেমে এলাম চৌরাস্তায় তথা ভ্যালেনটাইন ডে উদ্‌যাপনের কেন্দ্রস্থলে। আলো-আঁধারীর মধ্যে মাঝরাতের কর্মকাণ্ড। সেখানে এসে দূরে দাঁড়িয়ে দেখি, একদম বন্য ব্যাপার স্যাপার! র‍্যাশন্যাল ওয়ার্ল্ডের নয়, বিলকুল এ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডের দৃশ্যাবলী। পূর্ণ বয়স্ক যুবক-যুবতীরা দলে দলে একে অন্যের সাথে মত্ত হয়ে ঢলাঢলি করছে। একে অপরকে চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে আর বুকের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে নাচানাচির মাধ্যমে এরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসা বিতরণ করছে। নিছক ফ্রি স্টাইল যৌন আবেদন ছাড়া এই ভালোবাসা বিতরণের প্রক্রিয়াকে আর কিছুই বলে মনে হলো না আমার। গোটা এলাকায় এই একই দৃশ্য দেখে ধাঁধিয়ে গেল দুচোখ। ঢের হয়েছে আর নয় বলে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার বাম পার্শ্বে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো আমার। দেখি, জনাছয়েক যুবক দুভাগে ভাগ হয়ে দুজন যুবতীকে নিয়ে লুফালুফি করছে। তিন তিন জন যুবক এক একটা যুবতীকে হাতের ওপর চিৎ করে শুইয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে শূন্যে আর ঐ তিনজনই ফের যুবতীটিকে হাতের ওপর ধরে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে যুবতীটির গালে-মুখে-ঠোঁটে চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে অট্টহাসি হাসছে। যুবতীটিও হাসির সাথে উপভোগ করছে লম্পটদের এই নারকীয় লাম্পট্য। যৌনকর্ম সংঘটনের আগের এই উন্মাদনার নাম ভ্যালেনটাইন ডে তথা ভালোবাসা দিবসের ভালোবাসা বিনিময়। এসব পুরোপুরিই বিদেশী রুচি

ও বিদেশী সংস্কৃতি। আমাদের এক রত্তিও নয়, অথচ আমার দেশের যুবক-যুবতীরাই ঐ ঘৃণ্য সংস্কৃতির স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম।

থাক সে কথা। আস্তে আস্তে লম্পটদের ঐ দল দুটি এগিয়ে এলো আমার দিকে। আমি রাস্তার পাশেই একটা গাছের নীচে আধো আলো, আধো ছায়াতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাস্তায় ঢলে পড়ছে মাঝরাতের বিদ্যুতের আলো। আমার পাশ দিয়েই তারা এমন উল্লাস করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। ঐ দুই দলের যে দলটি প্রথমে কাছে এলো আমার, সেই দলের যুবতীটিকে দেখেই মাথাটা আমার ঘুরে উঠলো বনবন করে। একদম কাছে থেকে দেখা। দেখি যে মেয়েটাকে তারা শূন্যে তুলে নাচাচ্ছে, সে মেয়েটি আমারই সেই বিলকিস্ আরা বিউটি!

জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম। দিশেহারা হয়েই আমি চীৎকার করে আওয়াজ দিলাম, এ কি বিউটি! বিলকিস্ আরা বিউটি, তুমি!!

আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো বিউটি!

চিনতে পেরেই নাগরদের হাত থেকে লাফ দিয়ে নেমে মাঝ রাস্তার প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। আর তার হদিস করতে পারলাম না।

সেই থেকে বিলকিস্ আরা বিউটি আর আমার কাছে আসেনি। আমার ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি।

কদাচিৎ কখনো দূর থেকে তাকে এক ঝলক দেখতে পেলেও তার মাথায় আর কোন বোরকা বা আব্রু দেখিনি।

www.boighar.com

আরেক দফা আক্কেল হলো আমার। নিজেকে একটা বেআক্কল মনে করে নিজেকে ধিক্কার দিলাম নিজেই। আর কোন প্রেম-পিরীতের ত্রিসীমানা না মাড়ানোর প্রতিজ্ঞায় তুলো দিলাম কানে আর মন দিলাম পড়াশোনায়। পরীক্ষা সন্নিকট। অনেক গাফিলতি করে ফেলেছি পড়াশোনায়। আর লেশমাত্র গাফিলতিও আমার জন্যে হারাম।

যথাসময়ে হয়ে গেল এম.এ. ফাইন্যাল পরীক্ষা এবং ফলও বেরুলো যথাসময়ে। ফলাফল বরাবরের মতোই উৎকৃষ্ট হওয়ায় সংগে সংগে লেকচারার পদে নিয়োগ পেলাম ভার্সিটিতেই। ফলে অন্য কোন দিকে

আর নজর দেয়া নয়, এবার একজন সফল শিক্ষক হওয়ার শক্ত আরাধনায় নিয়োজিত হলাম। বন্ধ করে দিলাম দুনিয়ার রস-রং আর বসন্তের আনন্দের বিরুদ্ধে হৃদয়ের সকল দুয়ার। নিষ্ক্রিয় করে রাখলাম চারপাশের ভ্রমরীদের নিরন্তর হাতছানি আর গুঞ্জরণের বিরুদ্ধে চোখ-কান দুটোকেই।

কিন্তু খোঁড়ার পা নাকি বারবার খাদেই পড়ে। আক্কেল মন্দের আক্কেল নাকি চড় দেখালেই হয়, বেআক্কলের আক্কেল হতে নাকি বিরাশী সিক্কার তিন চড় লাগে। আমি তো দুই চড় খেয়েছি, তিন চড় খাইনি, আমার আক্কেল এত শিগ্গির হবে কেন? ফলে আবার আমি শিকার হলাম পুরাতন ব্যাধির অর্থাৎ আবার আমি আট্‌কা পড়লাম রমণীর জালে।

এবার অবশ্য ইচ্ছে করে নয়, বলা যায় নসীবের ফেরে। আরো সত্যি করে বললে বলতে হয় আক্কেলের অভাবে। কথায় বলে, 'ফকিরের পাছার মাড়ান, চোর ধরতে যায়।' আমারও হলো সেই দশা। আবার আমি ধরতে গেলাম রমণীর হাত।

বেবিট্যাকসিতে চড়ে নির্জন পথে যাচ্ছি। নির্জন পথ মানে সদর রাস্তার যানজটের বাইরে ভিন্ন এক রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটা বড়সড়ই। তবে অনেকটা ঘুরা পথ হিসাবে এ পথে যানবাহন আর লোক চলাচল কম। ট্যাকসি চালকের নজর সামনের দিকে স্থির। সামনে নজর রেখে সে গাড়ি চালাচ্ছে সাবধানে। এদিক ওদিক নজর দেয়ার অবকাশ তার ক্ষীণ। কিন্তু আমার নজর সকল দিকে ঘুরছে। ফুরফুরে হাওয়ায় গাড়িতে বসে এদিক ওদিক দেখছি আর মনে মনে গানের কলি আওড়াচ্ছি, 'হাওয়া মে উড়তা যায়ে, মেরে লাল দোপাট্টা......'

হঠাৎ দেখি লাল দোপাট্টা। মানে আমার সামনে রাস্তার একদম ধারে ঘাসের ওপর লাল দোপাট্টা উড়ছে। বেবিট্যাকসিটা পাশ কেটে যেতেই দেখি, লাল দোপাট্টা নয়, লাল শাড়ী। আরো ভালো করে দিখি, স্রেফ লাল শাড়ীই নয়, শাড়ীতে জড়ানো একটা মেয়ে। মস্ত বড় মেয়ে মানুষ।

দেখেই চমকে উঠলাম আর চমকে উঠে চালককে বললাম, এই রোখো, রোখো, শিগ্গির রোখো...!

বেবিট্যাকসি চালক ব্রেক চেপে গাড়ির গতি খাটো করতেই বললাম, পেছনে নাও, একটু পেছনে, জলদি।

ট্যাকসিটা ইতিমধ্যে অনেক খানি এগিয়ে গিয়ে ছিল। চালক গাড়িটা এবার পেছনে ঐ মেয়েটার পাশে আনতেই 'স্টপ-স্টপ' বলে লাফ দিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

নেমে এলাম গাড়ি থেকে আর ছুটে গেলাম মেয়েটার কাছে। প্রথমে ভেবেছিলাম লাশ। কাছে এসে দেখি লাশ নয়, এখনও প্রাণ আছে মেয়েটার দেহে। সে অস্ফুট কণ্ঠে গোঙ্গাচ্ছে আর একটা হাত কিসের আশায় যেন মাঝে মাঝেই একটু ওপরের দিকে তুলছে।

ট্যাকসি চালকটাও আমার পেছনে পেছনে মেয়েটার কাছে এসেছিল। মেয়েটাকে দেখেই সে আক্ষেপ করে বললো, এহ্‌রে, একদম শ্যাষ! গাড়ি চাপা পড়ে এর এখন অন্তিম অবস্থা।

বললাম, গাড়ির চাপায় এর এ অবস্থা হয়েছে। তো রাস্তা ছেড়ে এখানে মানে রাস্তার একদম কিনারে এই ঘাসের মধ্যে এলো কি করে?

চালক বললো, হয়তো চাকার ধাক্কায়। আগের চাকা চাপা দেয়ার পর পেছনের চাকায় বাড়ি খেয়ে হয়তো এখানে এসে পড়েছে।

বললাম, আহারে! মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে সমানে।

চালক বললো, গড়াবেই তো। চাকার চাপা খেয়েছে কিনা! এখনই মারা যাবে।

মারা যাবে? সেকি! এখানে পড়ে আছে, কেউ এতক্ষণ দেখেনি?

সময় আছে কার কোথায় সাহেব? তা ছাড়া খামাকা ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চায় ক'জন? সংগে সংগে সামনে পড়লে হয়তো... তা থাক সে কথা। চলুন সাহেব, গাড়িতে উঠে বসুন। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বলো কি! একে এভাবে ফেলে রেখে?

নয় তো করবেন কি! ওটা তো এখনই মারা যাবে।

মারা যাবে? বাঁচানো যায় না? মানে, দেখা যাক না চেষ্টা করে...!

বলতে বলতে আমি ছুটে গিয়ে মেয়েটার একটু ওপরে তোলা হাতখানা ধরে ফেললাম আর সেই হাত ধরে তাকে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। চালক বললো, করেন কি, করেন কি সাহেব?

আমি ব্যস্ত কণ্ঠে বললাম, আরে এসো না একটু। আমার সাথে ধরে একে গাড়িতে তুলে নাও জলদি। হকচকিয়ে গিয়ে চালক বললো, গাড়িতে! গাড়িতে নিয়ে কি করবেন?

বললাম, হাসপাতালে যাবো। আমার মনে হয় হাসপাতালে নিলেই একে বাঁচানো যাবে।

হাসপাতালে? কিন্তু...!

চিন্তা করো না, ন্যায্য যা ভাড়া তা তুমি পাবে।

বইঘর.কম ও রোকন

এবার দ্রুত এগিয়ে এলো সে। তখন দুজনে ধরে মেয়েটাকে আমার কোলের ওপর তুলে নিয়ে বসলাম। বললাম, চালাও গাড়ি। জোরে, খুব জোরে।

ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে চালক অনেক বেশি ভাড়া নিলো। মেয়েটাকে হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তারেরা জানালেন, এ রোগীকে বাঁচানো কঠিন। প্রচুর রক্ত ক্ষয় হয়েছে। এক্ষুণি আবার রক্ত পুশ্ করে দেখা যেতে পারে তাকে বাঁচানো যায় কিনা। তবে রক্ত লাগবে প্রচুর।

হতাশ হয়ে বললাম, প্রচুর রক্ত? তা দাম পড়বে কত?

ডাক্তারেরা বললেন, তা কয়েক হাজার টাকা। সঠিক অংকটা বলা যাবে না। যতখানি প্রয়োজন ততখানি রক্ত পুশ্ করতেই হবে।

রক্ত পুশ্ করলেই বেঁচে যাবে রোগী?

তাও বলা যাবে না। পুশ্ করে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি আমরা। বাঁচা না বাঁচা আল্লাহর হাত।

যদি না বাঁচে তাহলে রক্তের দামটা...!

বাঁচলেও দিতে হবে, না বাঁচলেও দিতে হবে। সেটা অগ্রিম আর এখনই। দেরী করলে আর বাঁচানোই যাবে না।

কিন্তু...!

আমাকে গড়িমশি করতে দেখে ডাক্তারেরা বললেন, আরে, রোগী আপনার মরো-মরো আর আপনি টাকার হিসেব করছেন! রোগী আপনার কে হয়? আপনার স্ত্রী বুঝি? নাকি আপনার মেয়ে না বোন? এ যে একেবারেই তরুণী!

বললাম, না, রোগী আমার কেউ নয়।

হতভম্ব হয়ে ডাক্তারেরা প্রশ্ন করলেন, কেউ নয়, কি রকম?

রক্তের কোন সম্পর্ক তো নেই-ই, আমার একবিন্দু পরিচিতাও নয়।

আমি সংক্ষেপে আর দ্রুত ঘটনাটা বর্ণনা করলাম। শুনে ডাক্তারেরা বললেন, তাহলে এ রোগী আপনি যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যান। বিনি পয়সায় চিকিৎসা এর হবে না।

বললাম, কোথায় নিয়ে যাবো? তাহলে তো ইতিমধ্যেই মারা যাবে।

মারা তো যাবেই। রক্ত না দিলে এখনই মারা যাবে। তাতে আমরা কি করবো?

এখনই মারা যাবে?

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, আরে মিয়া তাহলে এতক্ষণ শুনলেন কি? খামাকা আমাদের সময় নষ্ট করছেন কেন? যান যান, আপনি যখন রোগীর কেউ নন, আপনিই বা এত টাকা দেবেন কেন? শুধু রক্তের দামই তো নয়, এর সাথে চিকিৎসা খরচও আছে। যান, কোথাও নেয়ার পথ না থাকে, রোগীকে এখানেই রেখে চলে যান। জানটা বেরিয়ে গেলেই লাশ আমরা মর্গে পাঠিয়ে দেবো।

বড়ই মায়া হলো মেয়েটার জন্য। গোঙ্গানি তখনও শোনা যাচ্ছে একটু একটু। বিচলিত হয়ে উঠে আমি ব্যস্ত কণ্ঠে বললাম, দিন রক্ত। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

তাহলে দিন টাকা।

পকেটে যা ছিল তা সবই বের করে দিয়ে বললাম, এই টাকাটা রাখুন, অবশিষ্ট টাকা পরে এনে দিচ্ছি। মানে, যখন যা লাগবে, তখন তাই এনে দেবো।

আমার পরিচয় দিলাম। তাছাড়া পকেটের টাকার পরিমাণটাও নেহায়েত নগণ্য ছিল না। ডাক্তারেরা এবার খুশি হয়ে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং রক্ত পুশ্ করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে কয়েক বোতল রক্ত পুশ্ করাসহ প্রাথমিক চিকিৎসা অন্তে মেয়েটার চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার সাহেব বললেন, রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে কিছুটা। রক্ত পুশ্ করায় রোগী বেশ রেস্পন্স করছে। তবে এটাই চূড়ান্ত নয়। আরো রক্ত দিতে হবে আর এক্সরে করে যদি দেখা যায়, বুকের হাড়-হাড্ডি ভেঙে গেছে কিছু তাহলে অপারেশান করার পর বাঁচা-না বাঁচার কথাটা অনেকটা চূড়ান্ত করে বলা যাবে।

বললাম, আমি কি তাহলে যাবো এখন?

ডাক্তার বললেন, যাবেন তো রোগীর কাছে থাকবে কে? আমাদের নার্সরা রোগীর অবস্থা জানার জন্যে ঘন ঘনই আসবে বটে, তবে সার্বক্ষণিকভাবে তো তারা থাকবে না। রোগীর নিজের লোককে থাকতে হবে সব সময়।

কিন্তু রোগীর নিজের লোক কে বা কারা, তা তো কিছুই জানিনে।

জানতেও পারবেন না সপ্তাহ খানেকের আগে। রোগী যদি বেঁচেও যায়, এক সপ্তাহের মধ্যে নিজের পরিচয় দেয়ার মতো কোন জ্ঞান তার ফিরে আসবে এমন কথা বলা যাবে না। দায়িত্ব যখন নিলেন, আপনাকেই থাকতে হবে সব সময়।

বইঘর.কম ও রোকন

একটা সুবিধার কথা যে, তখন ভার্সিটিটা বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিনের জন্যে। তাই থাকলামই আমি রোগীর পাশে প্রায় দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা। মাঝখানে একবার গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনলাম। এরপরে আর আমি হাসপাতাল ত্যাগ করিনি। এই সময় স্রেফ রোগীর পাশে বসে থাকাই নয়, রোগীর শুশ্রূষার যাবতীয় কাজও করতে হলো আমাকে। স্বেচ্ছায় দায় গ্রহণ করেছি হেতু ভালো মন্দ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কোন কাজ করতেই কোন কার্পণ্য করলাম না। www.boighar.com

ছোট খাটো কিছু ফ্যাক্চার ছাড়া বড় রকমের হাড়-হাড্ডি শরীরের কোথাও না ভাঙার ফলে সপ্তাহ খানেকের চিকিৎসাতেই সুফল পাওয়া গেল। মেয়েটার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো আর সে তার পরিচয় জানাতে সক্ষম হলো। তার বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে সে বললো, নাম তার চাঁদ বানু। বাপ-মায়ের রাখা নাম। অপর নাম তার চন্দ্র মল্লিকা। মল্লিকা নামেই সে সর্বত্র পরিচিত। সেই সাথে মল্লিকা আরো জানালো, একটা মিনিবাস এসে তাকে ধাক্কা দিলো, এটুকুই মনে আছে তার। এর পরে আর কিছুই মনে নেই। আমি তাকে তুলে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি শুনে বারংবার সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে লাগলো।

খবর পেয়েই পড়ি মরি ছুটে এলেন মল্লিকার আব্বা-আম্মা। বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার। আব্বা আম্মা দুজনই শিক্ষিত। এই একটাই মাত্র সন্তান তাঁদের। মেয়েটিকে হারিয়ে তাঁরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটিকে ফিরে পাওয়ায় তাই তাদের মধ্যে আবেগ ও আনন্দের তুফান ছুটতে লাগলো। সেই সাথে পুন:পুন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন তাঁরা।

এ দৃশ্যে হাসপাতালের ডাক্তারেরা বললেন, বাঁচানোর মালিক আল্লাহ তায়ালা ঠিকই। কিন্তু সেই সাথে কিছু ধন্যবাদ এই তরুণ অধ্যাপকেরও প্রাপ্য। বিলকুল অপরিচিত আর অচেনা লোক হওয়া সত্ত্বেও এই অধ্যাপক যা করলেন আর করেছেন, এমনটি এ বিশ্বে বিরল। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে অন্যকে বাঁচানোর এ মন-মানসিকতা অন্য কারো মধ্যে দেখাই যায় না বড় একটা।

নার্সরা বললেন, সেটা না হয় উনার টাকা-পয়সা আছে বলে খরচ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ইনি রোগীর যে সেবা-যত্ন করেছেন এই সপ্তাহকাল ধরে, তার নজীর এ জগতে পাওয়া যাবে না আর কোথাও।

একেবারেই অপর একজন লোক হয়ে অচেনা এক রোগীকে বাঁচানোর এতটা আকুতি আর এমন শুশ্রূষা এর আগে আর কখনো দেখিনি আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, একজন অধ্যাপক মানুষ, অথচ রোগীর মল-মুত্রের কাপড়-চোপড় দুহাতে টেনেছেন ইনি। এমনটির কি তুলনা কিছু আছে কোথাও?

এরপর যে দৃশ্যের সৃষ্টি হলো, এক কথায় তা প্রকাশ করা কঠিন। মল্লিকার আব্বা-আম্মা উভয়েই একের পর এক ছুটে এসে পুত্রবৎ জড়িয়ে ধরলেন আমাকে এবং দোআ-আর্শিবাদে আর আদরে-সোহাগে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা আমাকে তাঁদের নিজ পুত্র বানিয়ে ফেললেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। শিক্ষিত ও সম্পদশালী পিতামাতা। সন্তান এই একটাই। সন্তানটিও অর্থাৎ চন্দ্র মল্লিকাও শিক্ষিতা ও সুন্দরী। শাদির বয়স অনেক আগেই হয়ে গেছে মল্লিকার। কিন্তু একমাত্র এই মেয়েটাকে কাছ ছাড়া করে দূরে কোথাও শাদি দেয়ার ইচ্ছে তাঁদের মানে মল্লিকার বাপ-মায়ের আদৌ ছিল না। মেয়েটাকে কাছে কাছে রাখার বড় ইচ্ছে তাঁদের। কিন্তু কাছে কোলে শাদি দেয়ার তেমন কোন ঘর বর এ যাবত তাঁরা পাননি। এবার আমার পরিচয় পেয়ে আর আত্মীয়-বান্ধবহীন আমি একজন ভাসমান মানুষ জেনে আমাকেই তাঁরা জামাই বানানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন। যুক্তি দেখালেন, যার প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি তার মালিক আমি আর তার দায়িত্ব নেয়াটা আমার নৈতিক কর্তব্য। সেই সাথে স্থির করলেন, ঘর জামাই থাকতে আমি নিতান্তই নারাজ হলে নিজের খরচে তাঁরা মেয়ে জামাইয়ের জন্যে একটা মনোরম বাড়ি বানিয়ে দেবেন তাঁদের বাড়ির পাশেই।

এসব পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে মল্লিকাকে শাদি করার প্রস্তাব তাঁরা আমার কাছে উপস্থাপন করলেন এবং আমার উত্তরের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে আবার কৃতজ্ঞতার বশেই হোক আর আমার চেহারা দেখেই হোক, মেয়েটাও এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলো।

আমিও ভেবে দেখলাম, প্রেম-পিরীতের কোন ঝুট-ঝামেলায় না গিয়ে মেয়ের অভিভাবকদের মাধ্যমে এই শাদিটা করে নেয়াই বেহতর। শাদি তো আমাকে করতেই হবে আজ না হয় কাল। আত্মীয়-বান্ধবহীন এই নিঃসঙ্গ জীবন তো আমরণ টেনে বেড়ানো যাবে না। নতুন করে আবার

বইঘর.কম ও রোকন

কোন ডাইনী-ডাকিনীর খপ্পরে পড়ার আগে এই মেয়েকে বিয়ে করলেই মিটে যাবে সব ঝামেলা।

চিন্তা-ভাবনা করে মল্লিকার পিতা-মাতাকে জানালাম, এ শাদিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে ঠিক এক্ষণেই শাদি করা সম্ভব নয়। সবেমাত্র চাকুরী পেয়েছি ভার্সিটিতে। চাকুরীটা একটু পাকাপোক্ত করে নিয়েই শাদি করবো মল্লিকাকে।

মল্লিকার পিতামাতা এ কথা খুশি হয়েই মেনে নিলেন। তবে তাঁরা সব সময় আঁকড়ে ধরে রাখলেন আমাকে। তাঁদের আতিথেয়তার আতিশয্যে পড়ে ভার্সিটির প্রাঙ্গণে আমার থাকা-খাওয়াটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

এভাবেই কাটতে লাগলো সময়। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি অধ্যাপনা করতে লাগলাম আর মল্লিকাকে শাদি করার জন্যে মনে মনে তৈরি হতে লাগলাম।

সাঁঝের পরে বাসে চড়ে ভার্সিটির দিকে যাচ্ছি। সাঁঝের আগে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। বাতাস বইছে জোরে জোরে। শরীরে আগে থেকেই একটু জ্বর জ্বর ভাব ছিল। ফলে ঠাণ্ডা অনুভব করায় একটা চাদরে গা মাথা মুড়ে চুপচাপ বসে আছি বাসের মাঝামাঝি একটা সীটে। আগে পিছে জোড়ায় জোড়ায় দুটো করে সীট। যাত্রী আজ কম থাকায় আমার সীটে আমি একা আর কেউ নেই। আমার সামনের দুই সীটই ফাঁকা। ঘন অন্ধকারের কারণে বাসের ভেতরে কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না বা চেনা যাচ্ছে না কাউকেই।

বাসটা এসে সামনের এক স্টপেজে থামলে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কথা বলতে বলতে বাসে উঠে এলো আর সীট খুঁজতে লাগলো। আমার সামনের সীট দুটো ফাঁকা দেখে ছেলেটা মেয়েটাকে বললো, এই যে, এখানে দুটো সীটই ফাঁকা। এসো, এখানে বসি।

দুজনই এসে আমার সামনের সীটে বসলো। বসেই ছেলেটি মেয়েটাকে বললো, কী তাজ্জব! সেই কতদিন পরে তোমার সাথে হঠাৎ আজ দেখা। এ সময় কোথা থেকে আসছো?

মেয়েটি বললো, এই নিকটেই এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। এখন বাড়িতে যাবো। কিন্তু তুমি এখানে কোথা থেকে মামুন ভাই? কোথায় যাবে?

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম আমি। এ কণ্ঠ মল্লিকার। ঘটনাটা জানার জন্যে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

বইঘর.কম ও রোকন

মামুন নামের ছেলেটি আফসোস্ করে বললো, কোথায় আর যাবো? পথ থেকেই এলাম আর পথেই নেমে যাবো এক জায়গায়!

মল্লিকা বললো, পথেই নেমে যাবে এক জায়গায়?

হ্যাঁ। তাই যাওয়া ছাড়া আর গতি কি? ঘরে মন টেকে না বলেই তো পথে পথে ঘুরছি।

সে কি মামুন ভাই? ঘরে মন টেকে না কেন?

কেমন করে টিকবে? হঠাৎ তুমি আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, এ দুঃখ আমরা সইবো কি করে?

চলে গেলাম মানে?

গেলে না? তুমি এখন একজনের ঘরণী হতে চলেছো। তুমি কি আর আমাদের আছো?

মল্লিকাও এবার কিছুটা উদাস কণ্ঠে বললো, ও, এই কথা! তাহলে শুনেছো সব?

একই রকম খেদ করে মামুন মিয়া বললো, শোনার কি আর বাকি থাকে? আকাশে চাঁদ উঠলে কে না দেখতে পায়? তা হঠাৎ তুমি এতটা নির্মম হলে কি করে?

মামুন ভাই!

www.boighar.com

আমাদের কথা একবারও ভাবলে না? আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে হঠাৎ একটা অজানা অচেনা লোককে তুমি বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা কিভাবে নিলে?

কি আর করবো মামুন ভাই! এটাই একটা কপালের লিখন!

মামুন মিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, কপালের লিখন কি রকম?

লোকটা যেমন একদিকে আমাকে বাঁচিয়ে বড়ই বেকায়দায় ফেলেছে আমাকে, অন্যদিকে আমার বাপ-মাও একেবারেই নাছোড়বান্দা। ঐ লোকটাকেই বিয়ে করতে হবে আমাকে। না করলে বাড়িতে আমার স্থান নেই।

স্থান নেই?

না। তাঁদের কথার অবাধ্য হলে তাঁদের সব কিছু থেকে তাঁরা আমাকে বঞ্চিত করবেন। তাই বাধ্য হয়েই ঐ লোকটাকে...!

বিয়ে করছো তুমি?

হ্যাঁ, মামুন ভাই। বাধ্য হয়েই বই কি!

বইঘর.কম ও রোকন

তাহলেই বোঝ, তুমি আমাদের একেবারেই ছেড়ে যাচ্ছো কিনা? মানে ত্যাগ করছো কিনা?

সে কি! ত্যাগ করবো কেন? তোমরা, বিশেষ করে তুমি আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। মানে ফ্রেন্ড। বিয়ে করলেই কি মেয়েদের ফ্রেন্ড, মানে বয় ফ্রেন্ড থাকতে নেই?

মল্লিকা!

স্বামী মেয়েদের একটাই থাকে, একাধিক থাকে না। কিন্তু একাধিক বয় ফ্রেন্ড এ যুগে কোন্ মেয়ের না আছে, বলো? অন্যের সাথে শাদি হলেও তোমরা যেমন আমার ফ্রেন্ড ছিলে, তেমনই ফ্রেন্ডই থাকবে। আমার বয় ফ্রেন্ড হিসেবেই তোমরা যাতায়াত করবে আমার অর্থাৎ আমার স্বামীর বাড়িতে।

বলো কি! সেটা কি তোমার ঐ স্বামী সহ্য করতে পারবে? শুনেছি লোকটা নাকি ঘোর মৌলবাদী?

না-না, মৌলবাদী নয়। লোকটা নামাজ রোজা করে আর ইসলামের নীতি আদর্শ মেনে চলে এই আর কি!

কণ্ঠে জোর দিয়ে মামুন মিয়া বললো, ঐ হলো, ও সব করলেই তো মৌলবাদী হয়ে গেল!

তা যদি হয়, হোক। তাতে আমার কি এসে যায়?

অনেক এসে যায়। মৌলবাদীরা তো স্ত্রীর কোন পুরুষ বন্ধু থাক, এটা সহ্য করে না। ও লোকটাও সহ্য করবে না। তখন তুমি বাধ্য হয়েই ভুলে যাবে আমাদের।

পাগল! সহ্য না করলেই হলো? বিয়ে করলেই কি আমি তোমাদের ভুলে যেতে পারি, বিশেষ করে তোমাকে কি আমার ভুলে যাওয়া সম্ভব? তুমি আমার কত দিনের বন্ধু!

তুমি ভুলতে না চাইলে কি হবে? ভুলতে তোমাকে বাধ্য করবে। বাধ্য না হলে স্বামীর ঘর ছাড়তে হবে তোমাকে।

তা যদি ছাড়তে হয় ছাড়বো। কয়দিন হলো স্বামী হয়েছে বলেই এত দিনের তোমাদের আমি ছাড়বো? দরকার হয়, ছেড়ে দেবো ও রকম অসামাজিক স্বামীর ঘর। আমার বন্ধু-বান্ধব, সমাজ-সংস্কার যে মানবে না, সে না চাইলেও তো তার ঘরে আমি একদিনও থাকবো না।

মামুন মিয়া খোশ কণ্ঠে বললো, বেশ, বেশ! সেটা অবশ্যই তোমার বাহবার কথা। কিন্তু একটা সমস্যা হলো, স্বামীর ঘর ছেড়ে এলে তোমার বাপ-মা তোমাকে স্থান দেবে তো বাড়িতে?

না দিলে বয়েই গেল! সেক্ষেত্রে আমি সরাসরি তোমাদের কাছে চলে আসবো। স্থান দেবে না তোমরা?

মামুন এবার আমতা আমতা করে বললো, আমরা? তা মানে, একজনের সাথে ঘর করার পরে অর্থাৎ এক বিছানায় রাত কাটানোর পরে আমাদের কাছে এলে অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলবে...!

প্রশ্ন তুলবে কি রকম? এক বিছানায় কিছু দিন রাত কাটালাম তো কি হয়েছে? আমি তুমি সবাইতো সবার সাথে আমরা নির্দ্বিধায় লীভ্-টুগেদার করি। ঐ লোকটার সাথে না হয় করে এলাম কয়দিন?

মল্লিকা!

আমার অন্য বন্ধুরা প্রশ্ন তুললে কি তুমিও সে প্রশ্ন তুলবে মামুন ভাই! তুমি আমার কত দিনের বন্ধু আর তোমার সাথেই তো আমি লীভ্-টুগেদার করেছি মানে এক বিছানায় গিয়েছি সবার চেয়ে বেশি।

মল্লিকার কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়লো। তা দেখে মামুন মিয়া তড়িঘড়ি বললো, তা বটে! তা বটে! না না, আমি কি সেপ্রশ্ন তুলতে পারি? আমি তোমাকে সাদরেই গ্রহণ করবো।

ধন্যবাদ মামুন ভাই! তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। আর এ কথাও তোমাকে বলে রাখি, ঐ লোকটার ঘর ছেড়ে যদি তোমার কাছে আসতেই হয়, তাহলে খালি হাতে আসবো না মামুন ভাই। লোকটার নাকি অনেক নগদ টাকা আছে! ওর ঘর থেকে বেরুনোর আগে ওগুলো সব হাতিয়ে নিয়ে তবেই বেরুবো।

এদের কথা শুনে আমার সর্বাঙ্গ অনেকক্ষণ ধরেই রি-রি করছিল। সীটে বসে থাকা অসহ্য হয়ে গিয়েছিল আমার। এই সময় সামনের এক স্টপেজে বাস থামতেই আমি ঝট্‌কা মেরে উঠে পড়লাম আমার সীট থেকে এবং মল্লিকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, আমার সব কিছু হাতিয়ে নেয়ার সে সুযোগই তোমাকে আমি দেবো না রঙ্গিলা বিবি! এই সালাউদ্দীন আর জীবনেও শাদি করবে না তোমাকে। এই মামুন মিয়াকেই শাদি করে নাও এখন। এতদিনের লীভ্-টুগেদার করা বন্ধু...!

বলেই আমি গট্‌গট্ করে নেমে এলাম বাস থেকে।

বইঘর.কম ও রোকন

বাস থেকে নেমে আর কোথাও দাঁড়ালাম না। সরাসরি রুমে এসে শাটপাট হয়ে পড়ে গেলাম বিছানায়। দুই হাতে কপালটা টিপে ধরে স্বগতোক্তি করলাম, হায় আল্লাহ আর কত জব্দ করবে তুমি আমাকে?

অন্তত এটার সাথে তো আমি ইচ্ছে করে প্রেম করতে যাইনি! তবুও এই বিড়ম্বনা কেন আবার?

ভাবতে লাগলাম, ঘটনা কি? প্রতিটি পদক্ষেপই আমার এমন মারাত্মকভাবে ভুল পদক্ষেপে পর্যবসিত হচ্ছে কেন? যে ডালটা ধরছি, কি কারণে যেন সেই ডালটাই মট্‌মট্‌ করে ভেঙে যাচ্ছে আপসে আপ্‌? গলদটা কোথায়?

এই গলদ খুঁজতে গিয়েই ধরা পড়লো, আমি রং নাম্বারে হাত দিচ্ছি বারবার। মনে পড়লো শাহাদত হোসেন শিবুর রুমমেট এবং আমার ক্লাসমেট রওশন আলীর কথা। আমার প্রথম রং নাম্বার শ্রীমতির প্রসঙ্গে রওশন আলী বলেছিল, 'এ যুগে শতকরা পাঁচটা আদর্শ মেয়ে খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর বুঝলে? এখন শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ মেয়েই বিপথগামী হয়েছে। ডিস্‌ অ্যান্টেনা আর মোবাইলের অভিশাপ তো আছেই, তার ওপর এদের প্রবলভাবে বিপথগামী করেছে একটা সেকুলার মহল। খুবই সজাগ হয়ে হাত না দিলে হাত তোমার বারবার রং নাম্বারে পড়বেই।'

বড়ই কায়েমী কথা। রওশন আলীর এই উপলব্ধির আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে তারিফ না করে পারলাম না। ঠিকই তো, আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে একটু সন্ধানী নজর নিয়ে তাকালেই তো সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে রওশন আলীর কথার সত্যতা। কিছু তথাকথিত প্রগতিবাদী মানুষের পাল্লায় পড়ে এ যুগের অধিকাংশ মেয়েই অধঃপাতে গেছে আর যাচ্ছে। এই মহলটি তাদের লাম্পট্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর আর আধুনিক মানুষের ধুয়া তুলে নারী পুরুষের ফ্রি মিক্‌সিং-এর সুযোগ করে নিয়েছে আর এই সুযোগে বিপথগামী করছে এদেশের অগণিত মেয়েদের। এর সাথে আছে আবার এই মহলটির অসাম্প্রদায়িকতার বুলি তথা ধর্মহীন জীবন। ব্যস্‌! আর বাধা থাকে কি, অধঃপাতের তালিকায় আর বাকি থাকে কি?

এই সব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দিয়েই অতঃপর দিন কাটতে লাগলো আমার। কিন্তু বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করেও কোন সমাধানে পৌঁছতে আমি

পারলাম না। স্ত্রীর একপাল বয় ফ্রেন্ড মেনে নিয়ে শহর নগরের যে সব মানুষ হাসিমুখে জীবন যাপন করে, তাদের সংখ্যা কত হবে? এ সব সর্বংসহা মানুষের সংখ্যা বড় জোর শতকরা দশ-বিশজনের অধিক হবে কি? তা যদি না হয় তাহলে বাদ-বাকিরা করবেন কি? বিয়ে-থা বাদ দিয়ে তারা সবাই কি চিরকুমার হয়ে থাকবেন, নাকি উটপাখীর মতো বালির মধ্যে মাথা গুঁজে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচার না দেখার ভান করে কাল কাটিয়ে দেবেন? অন্য মেয়েদের নিয়ে অধিক সমস্যা না হলেও সমস্যাটা তো শহর-নগরের অনেক মেয়েদের নিয়েই, বিশেষ করে এ সমস্যাটা প্রকট হলো কলেজ-ভার্সিটিতে পড়া বিপুল সংখ্যক মেয়েদের নিয়েই। রং নাম্বারে হাত পড়বে বলে কি সবাই তাহলে শহর-নগরের, বিশেষ করে কলেজ-ভার্সিটিতে পড়া মেয়েদের বাদ দিয়ে বিয়ের কনে খুঁজবেন? সমাধান খুঁজে পেলাম না এসব প্রশ্নের। www.boighar.com

অন্যের কথা বাদ থাক, এর ফলে সমস্যায় পড়ে গেলাম আমি নিজে। আমি করবো কি? চিরকুমারই থেকে যাবো তাহলে? বয় ফ্রেন্ডওয়ালা স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেও পারবো না, আবার বালির মধ্যে মাথা গুঁজে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচার না দেখার ভান করতেও পারবো না। তাহলে আমার গতিটা কি?

চিরকুমার হয়ে কাল কাটাতে খুব একটা আপত্তি আমার না থাকলেও, বিপত্তি দেখা দিলো চরম। পিতা-মাতা, আত্মীয়-বান্ধবহীন একেবারেই এক নিঃসঙ্গ জীবন আমার। এ জীবন যে চিরকাল বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম হঠাৎ এক প্রচণ্ড অসুখে পড়ায়। প্রায় দুসপ্তাহ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকার সময় মর্মে মর্মে বুঝলাম, পাশে একজন আপনজনের প্রয়োজন কতটা অপরিহার্য! টাকা দিয়ে রাখা আয়া-নার্স আর চাকর-চাকরানীদের দ্বারা সে অভাবটা যে মোটেই পূরণ হবার নয় তা বুঝলাম, এক গ্লাস পানির জন্যে সারারাত করুণভাবে কাত্‌রানোর মধ্য দিয়ে। যখন থাকে তখন আয়া-নার্স, চাকর-চাকরানী চারপাশে গম্‌গম্‌ করে। যখন নেই তো কেউ নেই। টাকা-পয়সা দিয়ে রাখা এ সব লোকজন হঠাৎ করেই কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় সবাই! সুযোগ পেলেই চুপি চুপি সরে পড়ে এক সাথে। এরা যার টাকা-পয়সা খায়, তার দুর্দশা কি হবে এটা মোটেও ভাবতে যায় না।

গভীর রাতে পানির তেষ্টায় মরণাপন্ন হওয়ার পরও এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে কাউকেই কাছে না পেয়ে রাজা মিডাসের মতোই

উপলব্ধি করলাম, 'গোল্ড ইজ নট এভ্‌রি থিং' অর্থাৎ বুঝলাম, টাকা দিয়ে রাখা ঘর ভর্তি অপরজন জীবনের পরম সহায় নয়, সেজন্যে একজন আপনজন দরকার।

অসুখ থেকে উঠে চিন্তা করে দেখলাম, কোন প্রেম-মুহব্বত নয়, খুঁজে-পেড়ে একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করার কোন বিকল্প নেই আমার। রওশন আলীর ভাষায়, এ যুগে শতকরা যে পাঁচজন আদর্শ মেয়ে আছে, তারই একজনকে খোঁজ করে বের করতে হবেই আর তাকে শাদি করে সংসার পাততে হবে আমাকে।

'লীভ্‌ লাইক কিং এ্যান্ড ডাই লাইক ডগ্‌' অর্থাৎ বাঁচার কালে রাজার মতো বেঁচে থাকা আর মরার সময় কুকুরের মতো মরে যাওয়া, এ জীবন আমি চাইনে। নিতান্তই কোন আদর্শ মেয়ে না পাওয়া গেলেও, অন্তত অন্যের সাথে লীভ্‌-টুগেদার না-করা একটা মেয়ে আমার চাই-ই।

এটা 'তোমরা যে যা বলো ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই' এই কথারই মতো। চাইলেই তো হবে না, ঐ হরিণটা পাওয়া যাবে কোথায় আর পাইয়ে দেবে কে? এ কথাটাও ভাবতে হবে। কাজেই ভাবতে লাগলাম, এমন মেয়েই বা খুঁজে বের করবো কি করে? কে কোথায় কোন্‌ অপকম্ম করেছে বা করেনি— এ কথাটা আমাকে বলে দেবে কে?

আরে দূর দূর! 'গ্রাপ্‌স্‌ আর সাওয়ার' বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে সংসার পাতার ধ্যান-ধারণা মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলাম এবং চিরকুমার হয়ে থাকার পরিকল্পনাটাই দৃঢ়ভাবে এঁটে নিলাম অবশেষে। মরি কুকুরের মতোই মরবো, খামাকা মরীচিকার পেছনে আর ছুটবো না। ব্যস্‌! অত:পর নিশ্চিন্তে অধ্যাপনা করতে লাগলাম আর চিরকুমার হয়ে কাল কাটানোর জোরদার প্র্যাকটিস্‌ করতে লাগলাম।

কিন্তু অজান্তেই আবার চিড় ধরলো আমার এ সিদ্ধান্তের মধ্যে। সিদ্ধান্তটা বদল করার কোন ইচ্ছে না থাকলেও একটা কৌতূহল চরিতার্থ করার ইচ্ছে কোন মতেই নিবৃত্ত করতে পারলাম না।

জার্নি বাই ট্রেন। লং জার্নি। একটা ইন্টার ক্লাস কামরার বাংকের ওপর বিছানা বিছিয়ে টান টান হয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল এক পাল তরুণীর বিপুল উল্লাস আর কলকাকলিতে। চেয়ে দেখি, ট্রেনটা একটা স্টেশানে থেমে গেছে আর প্রায় ডজন খানেক তরুণী উল্লাস আর হুল্লোড় করে

বইঘর.কম ও রোকন

আমার সেই কামরাটায় উঠছে। মুখে প্রায় সকলেরই উগ্র প্রসাধন আর পরনে উৎকট আধুনিক পোশাক। বড়-সড়ো একটা ইন্টার ক্লাস কামরা। বাংকের নীচে দুদিকে দুটি লম্বা লম্বা বসার আসন। আসন দুটি আপাতত খালি। তরুণীগণ ট্রেনে উঠে ঐ দুটি আসনেই হাত-পা ছড়িয়ে বসলো আর কলকণ্ঠে গল্প জুড়ে দিলো। আমি যে একটা লোক ওখানে বাংকের ওপর আছি, সেটা কারো নজরেই পড়লো না। বলা যায়, সেদিকে নজর দেয়ার ফুরসৎই কারো ছিল না।

একটু পরেই ছেড়ে দিল ট্রেন। তরুণীদের হাসাহাসি ও মাতামাতি চলতেই লাগলো পূর্ববৎ। কাকলি নামের একটা মেয়ে অপর একটা মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললো, গতকাল আমাদের কলেজের ফাংশানে গিয়েছিলি নাকি চামেলী?

চামেলী বিবি বললো, বলিস কিরে কাকলি? যাইনি মানে? আমি তো একদম সামনের আসনেই বসেছিলাম!

কাকলি বললো, তাই, তাহলে আমার সাদেক আলী শান্তনু ভাইয়ের বক্তৃতাটা শুনেছিস নিশ্চয়ই? নারী স্বাধীনতার ওপর তার ঐ জ্বালাময়ী বক্তৃতা? আহ্! শুনে আমার কল্‌জেটা ভরে গেল চামেলী!

কাকলি বিবি পরম তৃপ্তির সাথে হাত রাখলো তার বুকের ওপর। চামেলী বিবি তাজ্জব কণ্ঠে বললো, বলিস কি? ওর ঐ বক্তৃতা শুনেই তোর কল্‌জেটা ভরে গেল?

হুসনে আরা হাসি নামের একটা মেয়ে চোখের ঠারে বললো, ভরবে না? শান্তনুটা যে ওর বড়ই প্রিয় বন্ধু! বন্ধু মানে, বয় ফ্রেন্ড। কয়েকটা গার্ল ফ্রেন্ড থাকলেও ঐ শান্তনুর মতো এত প্রিয় ফ্রেন্ড ওর আর কেউ নেই। তাই তো শান্তনু একটা 'রা' শব্দ করলেও কলজেটা ওর ভরে যায়।

চামেলী বললো, আরে দূর দূর! কী যে বলিস হাসি! ঐ শান্তনুটার বক্তৃতা শুনে ক'টা লোক ক্ল্যাপ্ দিয়েছে বল? অথচ আমার ঐ চমক্ আলী চন্দন ভাইয়ের ব্যান্ড সঙ্গীতটা তো শুনলি আমার পাশে বসেই। বলতো দেখি, চন্দন ভাইয়ের ব্যান্ড সঙ্গীতের পাশে জেম্‌স, আইয়ুব বাচ্চু— এদের ব্যান্ড সঙ্গীত স্রেফ খ্যাঁক শেয়ালের হুককা হুয়া কিনা? আমার চন্দন ভাইয়ের ব্যান্ড সঙ্গীত শুনে দর্শক শ্রোতারা সবাই কেমন হাততালি দিলো, দেখেছিস্ তো? ওহ্! তা দেখে খুশিতে আমার নাচতে ইচ্ছে হলো।

হাসি বললো, বলিস কি?

পাশের বেঞ্চটায় বসে থাকা হাবিবা বেগম বেণু নামের একটা মেয়ে হাত নেড়ে বললো, ঐ, ঐ একই ব্যারাম। ঐ চন্দন মিয়া যে চামেলী বিবির কল্‌জের টুকরো! চন্দনের গান কেন, ঘুমন্ত চন্দনের নাকের ডাক শুনলেও আমাদের এই চামেলী বিবি খুশিতে মূর্ছা যায়।

জবাবে চামেলী বিবি দরাজ কণ্ঠে বললো, যাবেই তো! যাওয়ার মতো হলেই যায়। তোর বন্ধু, মানে তোর বয় ফ্রেন্ড সবেধন ঐ কছিমুদ্দীন কেষ্টোর মতো আমার শান্তনু কি নাচ-গানের নামে মৃগী রোগীর মতো এলোপাতাড়ি লাফায়? www.boighar.com

ক্ষেপে গেল বেণু বেগম। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, খবরদার চামেলী। আমার কেষ্টো ভাইয়ের নাচকে মৃগী রোগীর লাফানোর সাথে তুলনা করবিনে। আর সবেধন হয়েছে তো কি হয়েছে? তোদের মতো একাধিক মানে গণ্ডা গণ্ডা বয় ফ্রেন্ড আমি রাখিনে। গার্ল ফ্রেন্ড আমার আছে, কিন্তু পুরুষ বন্ধু আমার ঐ একটাই।

চামেলী বেগম বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটার কথাই বলছি। একেবারেই সোনার যাদু বটে।

বেণু সগর্বে বললো, সোনার যাদুই তো! কে না জানে, মন মাতানো গানের সাথে নেচে নেচে আমার বন্ধু ঐ কছিমুদ্দীন কেষ্টো একাই গতকালের ফাংশানটা মাতিয়েছে? ফাটিয়ে দিয়েছে অডিটোরিয়ামটা? হলে কি হবে সবেধন, ও একাই একশো।

এবার জনা তিনেক মেয়ে এক সাথে বললো, এ্যাঁ, তাই নাকি? তোর ঐ কেষ্টোটা গতকালের ফাংশান একাই মাতিয়েছে? একটা ঝামেলায় আটকে গিয়ে ফাংশানে যেতে পারিনি আমরা। তোর কেষ্টো ভাই কোন গানের সাথে নাচলোরে বেণু? তাকে তো গান গাইতে কখনো দেখিনি।

বেণু বললো, দেখবে কি করে? সে কি আধুনিক গান গায়? সে গায় সার্কাসের গান।

বক্তা মেয়ে তিনটি ফের এক সাথে বললো, বলিস্ কি! সার্কাসের গান? তাহলে শোনা ভাই ঐ সার্কাসের গানের খানিকটা। নাচের সাথে সার্কাসের কি গান গেয়ে তোর ফ্রেন্ড মানে বয় ফ্রেন্ড কেষ্টোটা গোটা আসর মাতালো? শুনিয়ে দে না একটু।

গর্বে ফুলে উঠলো বেণু বিবির বুক। বললো, তা যদি বলিস, তাহলে স্রেফ বসে বসে কেন, আমি আমার কেষ্টোর মতো নেচে নেচে গানটা শোনাতে পারি।

দুই বেঞ্চের প্রায় সকল মেয়ে এবার উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, পারবি? সাব্বাস! সাব্বাস! তাহলে তাই শোনাও না ভাই। নেচে নেচেই গাও না গানটা? আহা, বেণুর মতো করিৎকর্মা মেয়ে আর ক'জন আছে আমাদের মধ্যে।

বেণু এবার সত্যি সত্যিই উঠে এসে দুই বেঞ্চের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালো এবং জংলী নাচ নাচতে নাচতে কোমর বাঁকা করে গান ধরলো,

'ওরে, ওরে, ওরে আমার গোব্‌রার চাচীরে-
এই-এই-এই-এই-এ-
এত দুক্কু দিলুরে আমায় অকালে।
হাটেত্‌ থাইকা আননু আলু
সেই আলু তুই সব খালু।
খালু দালু ভালোই করলু, শেষে গোব্‌রারে দোষালুরে-
ওরে, ওরে, ওরে আমার গোব্‌রার চাচীরে
এই-এই-এই-এই-এ-
এত দুক্কু দিলুরে আমায় অকালে-।'

বেণু বিবি গানের সাথে জ্বীনে ধরা রোগীর মতো মাথার চুল আর বসন-আদি ছেড়ে দিয়ে এমনভাবে লাফাতে লাগলো যে, কামরার প্রায় সকল মেয়েই হাসির তুফান তুলে কামরাটা ফাটিয়ে ফেললো। বাংকের ওপর শুয়ে থেকে এ দৃশ্য দেখে মুখ চেপে নিঃশব্দে হেসে ফেললাম আমিও।

অত:পর কামরাটা জুড়ে চলতেই লাগলো নরম-গরমভাবে হাসাহাসি আর মাতামাতি। এক একজন এক একজনের পুরুষ বন্ধুর গুণ-গান গাইতে লাগলো কলরবে। এ হুটপাটের মধ্যে একেবারেই এক বিপরীত দৃশ্য চোখে পড়লো আমার। দেখলাম আমার বাংকের সামনের বেঞ্চের একেবারেই এক প্রান্তে উপবিষ্ট দুটি মেয়ে এমন তুমুল হুটপাটের মধ্যেও প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। এদের দুজনের পরনেই শালীন পোশাক-আশাক। এই দুজনের একজন অত্যন্ত সুন্দরী। এতটাই সুন্দরী যে, এই একপাল মেয়ের মধ্যে এতটা সুন্দরী আর কেউই ছিল না। সেই সাথে লক্ষ করলাম, আব্রু করা অপর মেয়েটির চেয়ে এই সুন্দরী মেয়েটির সর্বাঙ্গ আরো বেশি সুন্দর করে ঢাকা। দেখলাম, দ্বিতীয় মেয়েটা অন্য মেয়েদের কথায় একটু আধটু

বইঘর.কম ও রোকন

সাড়া দিলেও এই সুন্দরী মেয়েটা কোন কিছুতেই সাড়া দিলো না একবারও।

এই সময় মমতাজ বেগম মমী নামের এক মেয়ে ঐ সুন্দরী মেয়েটার পাশে বসা অর্থাৎ আব্রু করা দ্বিতীয় মেয়েটিকে লক্ষ করে বললো, সে কিরে জরিনা হক, তোরা যেন পর পুরুষের আসরে এসে বসে আছিস্ মনে হচ্ছে! আমরা সবাই এত আনন্দ উল্লাস করছি আর তোরা যে একদম স্পীক্‌টি নট্? মুখ বন্ধ করে বসে আছিস যে!

জরিনা হক নামের মেয়েটি বললো, না তো, একদম চুপ করে নেই তো। তোদের উল্লাসে অল্প করে হলেও অংশ তো আমি নিচ্ছিই।

মমী ফের বললো, তুই না হয় কিছু 'হুঁ-হাঁ' করছিস ঠিকই, কিন্তু তোর পাশে বসা ঐ সুন্দরী বুলবুলিটা? ও মেয়েটাকে তো একবারও মুখ খুলতে দেখলাম না। গতকালের অনুষ্ঠানের আলোচনায় একবারও অংশ নিতে দেখলাম না।

জরিনা বললো, কার কথা বলছিস্? এই জহুরা জেসমিনের কথা?

জি, জি, ঐ জহুরা বিবির কথা!

তা জহুরা তোদের আলোচনায় অংশ নেবে কি করে, বল্? ওতো গতকালের অনুষ্ঠানেই যায়নি। যা সে দেখেনি বা শোনেনি, তা নিয়ে আলোচনায় ও সাড়া দেবে কি করে?

ওমা, সেকি! যায়নি মানে? সেও তো আমাদের কলেজের ছাত্রী। কলেজের এত বড় একটা অনুষ্ঠানে সে যায়নি কি রকম?

রকম আবার কি? সে কি কোন ফাংশান-অনুষ্ঠানে যায় কখনো? তোরা দেখিস্নি, সে আব্রু করে ক্লাসে যায় আর ক্লাস থেকে ফিরে এসে হোস্টেলের রুমে বই খুলে বসে থাকে সব সময় অর্থাৎ, 'ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ' এর বাইরে কি এই জহুরার কিছু আছে? www.boighar.com

ও আচ্ছা। তা ওর কি কোন বয় ফ্রেন্ড নেই যে, অনুষ্ঠানে সেই ছেলেকে দেখতে যাওয়ার আগ্রহও তার হলো না?

বয় ফ্রেন্ড! কার? এই জহুরা জেসমিনের? তওবা, তওবা!

কী যে বলিস! কোন পুরুষ মানুষের মুখের দিকে যে কখনো চোখ তুলে তাকায় না, তার আবার পুরুষ বন্ধু! মানে, তোদের ভাষায় বয় ফ্রেন্ড? তবেই হয়েছে!

তার মানে? ও তাহলে তো কোনই সমাজ-সংসারে মেশে না।

বইঘর.কম ও রোকন

একদম না।

সর্বনাশ! তাহলে ওর আউট নলেজ বলে তো কিছুই হবে না। যারা শুধুই বুক-ওয়ার্ম তাদের জ্ঞান-বিদ্যা তো কখনই পাকাপোক্ত হয় না। পাকাপোক্ত হতে আউট নলেজ লাগে।

সেটা তো ঠিকই। কিন্তু সে কথা সে না বুঝলে তাকে বুঝায় কে? বলে, আউট নলেজের আমার দরকার নেই।

তাজ্জব! আউট নলেজের দরকার না থাকলেও বাইরে বেরোনোর দরকারটা তো জরুর আছে। দিনরাত ঘরের মধ্যে বসে থাকলে, আর না হোক, মানসিক রোগী হতে সে বাধ্য। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সে ফেলবেই।

তাতো বটেই। কিন্তু...!

আরে রাখো তোমার কিন্তু! ঐ এক ডালি রূপ নিয়ে স্রেফ ঘরের মধ্যে বসে থাকলে ওর শেষ পরিণতি যা হবে, তাতে কি কোন বর ওর জুটবে? মরুক, মরুক! যার মরার শখ সে মরুক!

বলেই মুখ ফিরিয়ে নিলো মমতাজ বেগম মমী এবং অন্য মেয়েদের সাথে আলোচনায় লিপ্ত হলো।

এবার জরিনা হকও ঘুরে বসলো তার পাশে বসা ঐ সুন্দরী মেয়েটির দিকে এবং বললো, মমীটা কিন্তু ভুল বলেনি জহুরা। তোমার কিন্তু সত্যি সত্যিই কিছুটা বাইরে বেরুনো দরকার, অন্তত শরীর আর মনের খোরাক কিছু যোগাতেই হবে তোমাকে, নইলে একটা মানসিক রোগী হয়ে যাবে তুমি।

জহুরা জেসমিন বললো, তা যে কিছুটা বুঝিনে, এমন নয়। কিন্তু...!

এখানে কিন্তু কি? তুমি তো আর এখন শহরে থাকছো না যে, শহরের ঐ বেপর্দা পরিবেশে বেরোতে যাবে তুমি। এখন তো গাঁয়ের বাড়িতে থাকছো। টেস্ট পরীক্ষার পরে ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেল। এই পাঁচ ছয়টা মাস হোস্টেলে না গিয়ে বাড়িতেই থাকবে, এ কথা তো তুমিই বলেছিলে?

হ্যাঁ, সেই ইচ্ছেই আছে। বিশেষ দরকার না হলে এর মধ্যে আর কলেজে ফিরে যাবো না।

তাহলে এই বাড়িতে থাকার সময় মাঝে মাঝেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসো। সকাল বিকেল যখনই পারো, চলে এসো আমাদের পাড়ায়। শহরের ঐ বেহুদা ভিড় গাঁয়ে তো আর নেই। নেই বখাটেদের কোন

বেহায়াপনা। বিকেলে এলে বেলাভর নিরিবিলি নদীর তীরে বসে চুটিয়ে গল্প করা যাবে।

না ভাই, বাড়িতে থাকলেও কি এত সময় পাবো আমি? আব্বা-আম্মা দুজনই অসুস্থ মানুষ। বাড়িতে গেলে বাড়ির ঝুট-ঝামেলার অনেকটাই এসে আমার ঘাড়ে পড়বে। এর সাথে থাকবে আমার পড়াশোনা। স্রেফ এই দুটো দিক হলেও কিছু সময় বের করতে পারতাম। কিন্তু এর পরেও সব চেয়ে বড় ঝামেলা হচ্ছে, আমার ছোট ভাই দুটির মানে আফাজ-হাফিজের পড়ানোর ঝামেলা। আমি না থাকলে তো ওরা পড়েই না। বাড়িতে থাকার কয়দিন আমি ওদের না পড়ালে ওরা গোমূর্খ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ?

সকালে বিকেলে ওদের পড়াতেই হবে আমাকে। আমি আর বাইরে বেরুবো কখন?

বটে! তা কোন্ ক্লাসে পড়ে ওরা?

একজন ক্লাস ফোরে আর একজন ক্লাস থ্রীতে।

তো এ আর সমস্যা কি? ভালো দেখে একটা প্রাইভেট টিউটর রেখে দাও।

এটাই তো সমস্যা। ভালো টিউটর পাবো কই? এত নীচু ক্লাসে পড়ানোর ভালো শিক্ষক চাইলেই কি পাওয়া যায়? আগেও তো চেষ্টা করে দেখেছি? কিন্তু পাইনি।

চেষ্টা করে দেখেছো কিভাবে? বাড়িটা তো তোমাদের রেলওয়ে স্টেশানের পাশেই। ঐ স্টেশানের ওয়েটিং রুমের দেয়ালে মোটা বেতনের কথা উল্লেখ করে একটা নোটিশ মানে বিজ্ঞাপন সেঁটে দাও, দেখবে, ক্যান্ডিডেটরা কাতার ধরে আসতে থাকবে। ওদের মধ্যে থেকে বেছে একজনকে নিয়ে নাও।

জহুরা জেসমিন নামের মেয়েটি উৎসাহী হয়ে উঠে বললো, এ্যা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! একথা তো আগে কখনো ভাবিনি। তাহলে তাই করবো। এবার বাড়িতে পৌঁছেই প্রাইভেট টিউটর চাই মর্মে একটা নোটিশই এঁটে দেবো স্টেশানে।

www.boighar.com

হ্যাঁ, তাই দাও। দিয়ে বাইরে বেরোনোর একটু সময় করে নাও।

দেবো, দেবো, নির্ঘাত দেবো। তুমি দেখে নিও, এবার এ উপদেশের কোন ব্যতিক্রম হবে না।

মীর সাহেবের বাড়ির বারান্দায় মীর সাহেবের পাশে বসে এ কাহিনী এই পর্যন্ত বলে একটু থামলো সালাউদ্দীন আহমদ। এরপর আবার সে বলতে লাগলো, ট্রেনের বাংকে শুয়ে থেকে এদের এই আলোচনা স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি। শুনতে পেয়ে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আদর্শ মেয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি অনেক। কিন্তু খুঁজে কোথাও পাইনি। শাদি করার জন্যে না হোক, এই জহুরা জেসমিন নামের মেয়েটা সত্যি সত্যিই একটা আদর্শ মেয়ে কিনা অর্থাৎ শতকরা ঐ পঁচানব্বই ভাগ মেয়েদের মতো এ মেয়েটাও ঐ একই পথের পথিক, না এটা একটা সত্যি সত্যিই ব্যতিক্রম, এটা যাচাই করে দেখার বড়ই ইচ্ছে হলো আমার। তাই ঐ জহুরা জেসমিনকে অনুসরণ করে তার স্টেশান পর্যন্ত এলাম এবং সে স্টেশানে নেমে গেলে অলক্ষে আমিও সেখানে নেমে পড়লাম আর ফেরত ট্রেন ধরে সরাসরি ভার্সিটিতে চলে গেলাম। ভার্সিটিতে গিয়েই একটা লম্বা ছুটির দরখাস্ত আমার হেড অফ দি ডিপাটমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে পরের দিনই আমি আবার চলে এলাম জহুরা জেসমিনদের সেই স্টেশানে।

এসে দেখি, হ্যাঁ, ঠিকই গৃহশিক্ষক চাই মর্মে একটা নোটিশ তথা বিজ্ঞাপন ওয়েটিং রুমের দেয়ালে সেঁটে দেয়া হয়েছে। ব্যস্ আর কথা কি! আল্লাহতায়ালার নাম নিয়ে চলে এলাম আপনাদের ইন্টারভিউতে। আসল পরিচয় গোপন করে ইন্টারভিউ দিয়ে আমি সফলকাম হলাম আর নিয়োজিত হলাম আপনাদের বাড়িতে বাজার সরকার আর গৃহশিক্ষকের চাকুরীতে। এসে অবধি আমার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের সাথে পত্রের মাধ্যমে আমি যোগাযোগ রাখছি আর এখানে কর্মরত আছি। আমার ঐ একই লক্ষ, শাদি হোক না হোক, এ মেয়েটা বাস্তবিকই একটা ব্যতিক্রম কিনা, মানে এটা একটা খাঁটি সোনা, নাকি অন্যদের মতো খাদেভরা নকল সোনা, তা পরীক্ষা করে দেখা। এ যাবত এই পরীক্ষাই করে দেখলাম। দেখা আমার শেষ এখন। কাজেই এবার আমার এখান থেকে চলে যেতে আপত্তি থাকার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। যাওয়ার কথা না বললেও আমি আপ্সে আপ্ চলে যাবো।

বইঘর.কম ও বোকুন

সালাউদ্দীনের কথার প্রেক্ষিতে সেখানে উপস্থিত সালাউদ্দীনদের ডিপার্টমেন্টের অফিস-সহকারী মোজাম্মেল হক সাহেব প্রশ্ন করলেন, তা পরীক্ষা করে কি দেখলেন স্যার?

সালাউদ্দীন বিপুল আবেগে বললো, খাঁটি সোনা হক সাহেব, একেবারেই খাঁটি সোনা! খাদের লেশমাত্র এর মধ্যে নেই।

বলতে বলতে শীতে থরথর করে কেঁপে উঠলো সালাউদ্দীন। গায়ের চাদরটা আরো এঁটে সেঁটে গায়ে জড়িয়ে সে মোজাম্মেল হক সাহেবকে বললো, আমাকে একটু ধরুন হক সাহেব। জ্বরটা আমার আবার একটু বেড়ে গেল মনে হচ্ছে। আমাকে ধরে এখান থেকে আপাতত ঐ হানিফ স্যারের ওখানে নিয়ে যান। ওখান থেকে আগামীকালই ভার্সিটিতে পৌঁছে দেবেন আমাকে। আমার জন্যে এই কষ্টটা আপনাকেই করতে হবে হক সাহেব। আমার বিশেষ অনুরোধ। www.boighar.com

মোজাম্মেল হক সাহেব বললেন, ছি, ছি! অনুরোধ করতে হবে কেন স্যার? আপনার জন্যে এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট আমি হাসি মুখে সব সময় করতে রাজী আছি। আসুন...!

মোজাম্মেল হক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। জহুরা জেসমিন অন্যদের সাথে আঙিনাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যেই সে ছুটে এসে সালাউদ্দীনের কপালে হাত দিলো। হাত দিয়েই সে চমকে উঠে বললো, উহ্! জ্বরটা একটু বেড়ে যাওয়া বলে কাকে? এঁর যে কপালটা পুড়ে যাচ্ছে! জহুরা জেসমিন হাঁক দিয়ে বললো, জামাল চাচা, শিগ্গির এসে আমার সাথে ধরো তো এঁকে। এখনই এঁকে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে শুইয়ে দিতে হবে আর সাথে সাথে ডাক্তার ডাকতে হবে। www.boighar.com

একথা শুনে সালাউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো, আবার আপনার ঘরে কেন?

মেম সাহেব? আমাকে তো এখনই চলে যেতে হবে!

কান্নাভেজা কণ্ঠে জহুরা জেসমিন বললো, এরপরেও কি করে ভাবলে, তোমাকে আমি চলে যেতে দেবো?

সালাউদ্দীন বললো, মেম সাহেব!

জহুরা জেসমিন গলায় জোর দিয়ে বললো, আমি কি তা দিতে পারি? বলো, তা পারি আমি?

সমাপ্ত

বইঘর.কম ও প্রাকন